ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ।। ১৯ পৌষ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৪ জানুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

ধৃত জঙ্গিরাই স্বীকার করছে পশ্চিমবঙ্গই নিরাপদ আশ্রয়স্থল

গুঢ়পুরুষ।। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নববর্ষের সূচনাতে যদি প্রশ্ন করা হয় ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে বড় সমস্যা কোনটি হবে তবে অনেকেই বলবেন 'সন্ত্রাস'। ঠিকই। সন্ত্রাস দমনই নিঃসন্দেহে নতুন বছরে রাজ্যের কাছে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে। তা সে মাওবাদী সন্ত্রাসই হোক অথবা জেহাদি সন্ত্রাস। প্রথমটি রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় সন্ত্রাস। এই দুই সন্ত্রাসেরই লক্ষ্য—হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পদানত করা। দুর্বল বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই দুই সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কতটা সক্ষম হবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে ২০০৯ সালে মাওবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলায় বুদ্ধবাবুরা যে ব্যর্থ সে কথা আমাদের জানা।

মাওবাদী সন্ত্রাস সাধারণভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জঙ্গল এলাকায় সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সংকল্প নিয়ে এগোলে মাওবাদীদের উৎখাত কঠিন নয়। কিন্তু ইসলামি জেহাদি সন্ত্রাস দমন এই রাজ্যে প্রায় অসম্ভব। কারণ একটাই। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামদল এবং প্রধান বিরোধী জোট কংগ্রেস ও তৃণমূল মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক দখলের জন্য যে ভাবে উঠে পড়ে মুসলিম তোষণ চালাচ্ছে তাতে জেহাদিদের এই রাজ্যে নিরাপদে আত্মগোপন করে অন্তর্ঘাত চালানোটা অতি সহজ হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে জেহাদিরা সহজেই

(এরপর ৪ পাতায়)

বারাসত রোডে বিদ্যার্থী পরিষদের শোভাযাত্রা (খবর ভেতরের পাতায়)

সঙ্ঘের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতা ছুঁয়ে গেলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। পাটনা থেকে নাগপুর যাওয়ার পথে ২৬ ডিসেম্বর শনিবারে। এখান থেকেই সময় বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবিরে। এই চলার পথে আলাপচারিতায় উঠে এল গো-গ্রাম যাত্রার কথা। ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের কাছে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' চাওয়া হয়েছিল। ওঁর হাতে বিশ্ব তথা ভারতের গ্রামের স্বার্থে গোরক্ষার দাবী সম্বলিত প্রায় দশকোটি মানুষের স্বাক্ষরিত পত্র তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘটনা হলো একটু অবাক করার মতো। রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকেই বরং জানানো হলো, এরকম একটি ঐতিহাসিক কার্যক্রমের জন্য আপনারাই বরং রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান।

না, এখানেই শেষ নয়। আরও একটু যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা মোহনজীর পরের কথাটায় জানলাম। বিদর্ভে এই স্বাক্ষরপত্রে প্রথম যিনি স্বাক্ষর করেছেন তাঁর নাম দেবী সিং শেখাওয়াত—রাষ্ট্রপতির স্বামী। জানালেন, যেখানে যেখানে চেষ্টা হয়েছে সেখানে বিপুল সফল হয়েছে এই যাত্রা।

পাটনার খবরটা কলকাতার সংবাদ মাধ্যম গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে জানালে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি একটু হাসলেন। বললেন 'বেস্ট'। স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতি, অনুশাসন, শারীরিক কার্যক্রম অথবা সার্বিক ব্যবস্থা—অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। সমরসতা নির্মাণের লক্ষ্যে যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে প্রায় ৮০টি পন্থের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে ভোজন করেছেন। জাতপাতের ঊর্ধে উঠে হিন্দু হিসাবেই যে পরিচয় দিতে হবে এবং এতেই হিন্দুস্থানের উত্থান হবে—এ বিষয়ে ওই বৈঠকে সবাই একমত পোষণ করেছেন।

একটু থেমে মোহনজী এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনাদের এখানে প্রস্তুতি কেমন? পাশে থাকা পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জি জানালেন—জোর প্রস্তুতি চলছে। ৯২-এর কল্যাণী শিবিরে সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। সেখানে অবশ্য উত্তরবঙ্গের ৪ হাজার ছিল। যদি সেটা ছেড়েও দেওয়া যায়, তবে এবার শহীদ মিনারের সমাবেশে শুধু ইউনিফর্মেই কমপক্ষে ১৫ হাজার স্বয়ংসেবক থাকবে।

বললাম, এবার বিহার কি সংখ্যায় সব থেকে বেশি ছিল? মোহনজী বললেন, না। সব থেকে বেশী ছিল জব্বলপুরে। যেখানে গণবেশে (ইউনিফর্মে) স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার ৯৯৬ জন। স্টেডিয়ামে জায়গা না হওয়ায় বাকি ৫ হাজারকে বাইরে বসতে হয়েছিল। এবছর মোট ২৫টি শহরে এরকম কার্যক্রম হওয়ার কথা। গুয়াহাটি, শিলচর, লক্ষ্ণৌতে মার্চের মধ্যেই হবে। সব শেষে হবে ঝাড়খণ্ডে—এপ্রিলে। নির্বাচন হওয়ার জন্যই এটা পেছিয়ে গেছে।

কথাসূত্রে কথা উঠে আসে। মোহনজী বললেন, সঙ্ঘের 'অ্যাকসেপ্টেন্স' ক্রমশ

(এরপর ৪ পাতায়)

বিনানী ধর্মশালা চত্বরে মোহনজী।

মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তোলা বাড়ছে মাওবাদীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে নিজেদের খাই-খরচা ও অস্ত্র-শস্ত্র কেনার টাকা জোগাড় করতে 'তোলা' বাড়িয়ে দিল মাওবাদীরা। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আধিকারিকের ভাষায় ''অতি বামপন্থীদের ব্যবসায়িক টার্নওভার এখন বার্ষিক ২০০০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অথবা কন্ট্রাকটারকে নকশালদের সুরক্ষা অর্থ (প্রোটেকশন মানি) প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।'' মূলত খনি এলাকাগুলো থেকেই মাওবাদীরা প্রভূত পরিমাণে 'তোলা' তুলছে বলে খবর। প্রশাসনের একটা সূত্র বলছে, ব্যবসার আয়তন অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'তোলা'র পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। গোপন সূত্রের তদন্ত থেকে জানা যাচ্ছে, কোন ব্যবসার কী পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে বিগত এক দশকে, 'তোলা' আদায় করার সময় সেই হিসাবটাও মাথায় রাখা হয়েছে। যেমন পাকা রাস্তা তৈরিতে যে কনট্রাকটাররা জড়িত

অতি বামপন্থীদের বার্ষিক ব্যবসায়িক টার্নওভার ২০০০ কোটি টাকা

তাঁদের লাভের অঙ্কের ওপর বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ৫ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ ওইসব কনট্রাকটারদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করছে মাওবাদীরা আগের চাইতে দ্বিগুণ হারে। এছাড়া ব্লক উন্নয়ন স্কীমে রাস্তা মেরামতের সঙ্গে যুক্ত কনট্রাকটারদের কাছ থেকে আদায় করা তোলার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫ থেকে ৭ শতাংশ। সেতু ও জলাধার মেরামতিতে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায়কৃত 'তোলা'র পরিমাণও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এধরনের 'তোলা'র বৃদ্ধির পরিমাণ বার্ষিক লাভের ওপর ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫ শতাংশ হয়েছে। সরকারী ভবন তৈরিতে নিযুক্ত কনট্রাকটারদের বার্ষিক লেভির পরিমাণ এখন ৭ শতাংশ হয়েছে। আগে ছিল ৫ শতাংশ। রেললাইন তৈরি এবং রেলের অন্যান্য কাজের কনট্রাকটারদের তোলা দিতে হচ্ছে বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে। এছাড়া রেলের কোনও অংশের নিলাম হলে তার মূল্যের ওপর ১০ শতাংশ হারে তোলা আদায় করছে মাওবাদীরা। পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা ৫০০০-এর পরিবর্তে ৮০০০ টাকা করে তোলা দিচ্ছেন। এখন যন্ত্রের মাধ্যমে এই জিনিসটা ভাঙলে তার 'লেভি' আট থেকে বেড়ে ষোলো হাজার হয়েছে। ইটভাটার মালিকরা চিমনী পিছু বার্ষিক ১৫,০০০ টাকা করে মাওবাদীদের 'লেভি' দিচ্ছেন। পেট্রোল পাম্প মালিকদের ক্ষেত্রে 'তোলা'র এই হার বার্ষিক ২৫,০০০-এ গিয়ে ঠেকেছে।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

নবীনের আবাহনেই বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সাধে কি আর কবিগুরু বলেছিলেন—"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা! আধমরাদের যা মেরে তুই বাঁচা।" বঙ্গীয় 'আধমরা'রা আদৌ বাঁচবে কিনা কিংবা বাঁচলেও জীবন্মৃত হয়েই থাকবে কিনা তা সময় নামক একটি গড্ডালিকা প্রবাহ বললেও, বিদ্যার্থী পরিষদের নবীনরা তাদের যা দেওয়ার কাজটা শুরু করে দিল সদ্যসমাপ্ত সোদপুরের রাজ্য সম্মেলন থেকেই। হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর—এই তিনদিন জনা তিনশ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের ঘোলায় আয়োজিত হলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। একদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলনের ষাট বছরে পদার্পণ (কেননা ১৯৪৯-এ জন্মলগ্নের পর দীর্ঘ দু' দশক ইতিমধ্যেই পার করে ফেলেছে পরিষদ), অন্যদিকে শিক্ষা-প্রাঙ্গণে রক্তক্ষয়ী হিংসা—এই ডিলেমার অবসান ঘটিয়ে 'সেভ ক্যাম্পাস-সেভ এডুকেশনে'র দাবীতে নতুন করে মুখরিত হলো বঙ্গের আকাশ-বাতাস।

তিনদিনের সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি হিসেবে রবিরঞ্জন সেন এবং রাজ্য সম্পাদিকা হিসেবে পারুল মণ্ডলই পুনর্নির্বাচিত হলেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ২৬ ডিসেম্বর সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব প্রতাপ রুডি। তার আগেই ষাট বছরের যাবতীয় কীর্তি নিয়ে গড়ে তোলা একটি প্রদর্শনীশালার উদ্বোধন করেন প্রবাসী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য। তিনিই বিদ্যার্থীদের বিশ্বরূপ দর্শনের যাবতীয় দায়ভার নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের ২২টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত স্বাগত জানান, রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত হওয়া স্বাগত সমিতির সভাপতি পূজন সেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সম্পাদক গোপল সরকার। সম্মেলন উপলক্ষে ২৭ তারিখ আয়োজিত হয় শোভাযাত্রা ও প্রকাশ্য সমাবেশ। বয়সে কিশোর আর স্লোগানে পরিণত—এই দু'য়ের মিশেলে বিচিত্র শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকল বারাসত রোড ও সোদপুর ওভারব্রীজ। সোদপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দেন রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মন্ডল, পরিষদের ছাত্রী পূর্ণকালীন ও প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদিকা আশা লাকড়া এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নবীন প্রজন্মের চার প্রতিনিধি—কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের অমিত সামন্ত, বসিরহাটের সুবীর হালদার, সিকিমের নামদুং-এর চেতারাম কৈরালা ও হাওড়ার সৌরভ দীর্ঘাঙ্গি। এছাড়া ঋষি বঙ্কিমের নামে নামাঙ্কিত পরিষদের সম্মেলন স্থানে প্রাক্তন সভাপতি সুহাস মজুমদারের নামাঙ্কিত সভাগৃহে ষাট বছরে বিদ্যার্থী পরিষদের অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক বি. সুরেন্দ্রন। সম্মেলনের শেষদিনে সমারোপ ভাষণ দেন বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

সোয়াইন ফ্লু প্রতিষেধক

সোয়াইন ফ্লু-তে মরার ভয়টা বোধহয় এবার একটু কমল। কারণ এইচ ওয়ান এন ওয়ান (সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস) ভ্যাকসিন-এর প্রথম ব্যাচ জানুয়ারি-র শেষ দিকেই এসে পড়ছে ভারতে। যার সৃষ্টিকর্তা সানোফি পাস্তুর। এই ফ্রেঞ্চ ভ্যাকসিনকে আরও কার্যকর করে তুলেছে তিনটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী—বাক্সটার, জি এস কে এবং নভার্টিস।

যমের দক্ষিণ দুয়ার

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে ব্যাঙ্গালোর-বাসীগণ ডিসেম্বরের ২৭ তারিখে যমের দক্ষিণ দুয়ারেই তাদের অবস্থান বলে সম্ভবত ভেবে নিয়েছিলেন। কারণ সেদিন তাঁরা শহরের ঠিক মধ্যিখানে চল্লিশ ব্যারেল রাসায়নিক ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। যার গায়ে লেখা ছিল—অতীব দাহ্য, ইজরায়েল থেকে আমদানীকৃত। শেষে পুলিশের কাছে এই খবর গেলে তারা পরদিন বিকেলের দিকে এগুলো নিরাপদ দূরত্বে সরানোর বন্দোবস্ত করেন।

নিউক্লিয়ার শক্তিধর সাবমেরিন

২০১০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতে আসতে চলেছে নিউক্লিয়ার শক্তিধর সাবমেরিন। তার আগেই অবশ্য গত ২৮ তারিখ রাশিয়া আকুলা-২ জাতের নিউক্লিয়ার শক্তিধর সাবমেরিন বাজারে আনল। এর নাম কে-১৫২ নেরপা। ২০০৪-এর জানুয়ারিতেই ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক মূল্যে ভারত-রাশিয়ার একটি গোপন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। যেখানে বলা হয়েছিল এয়ারক্রাফট বাহক অ্যাডমিরাল গোরস্কভ এবং ১৬ মিগ-২৯ কে সাবমেরিনকে সক্রিয় করার বন্দোবস্ত হবে। ১২,০০০ টনেরও অধিক ওজনসম্পন্ন নেরপা সেই চুক্তিরই ফসল।

শিয়া-সুন্নী সমাচার

পাকিস্তানে সংখ্যালঘু শিয়া গোষ্ঠীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ের অত্যাচার চলছেই। গত ২৮ ডিসেম্বর মহরমের দিন করাচিতে শিয়াদের একটি শোভাযাত্রায় বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান অন্তত ৩০ জন। করাচিতে এই নিয়ে উপর্যুপরি তৃতীয়বার এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটল।

গগৈ-এর শয়তানি

অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নিজের রাজ্যকে সন্ত্রাসবাদীদের আখড়ায় পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। সেই কারণে গত ২৮ ডিসেম্বর অসম জুড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—তাঁর সরকার পরেশ বড়ুয়াকে আলোচনার টেবিলে আনতে সবরকম চেষ্টা করছে। এই সেই পরেশ বড়ুয়া, যিনি উত্তর-পূর্বের জঙ্গি সংগঠন উলফার চীফ কম্যান্ডার এবং যার ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় চীন ও বাংলাদেশ তাঁকে আশ্রয়দান করেছে!

স্নেহের স্বভাব

উফ্, জাঁকিয়ে কি ঠাণ্ডাটাই না পড়েছে। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বাজারে কিনা ডিসেম্বরেই তাপমাত্রা দশ ডিগ্রীর ঘরে! এটাই সর্বকালীন রেকর্ড। বরফে ঢেকে গিয়েছে কাশ্মীরের ডাল লেকও। আসুমদ্রহিমাচল কাঁপছে শীতে। কিন্তু বাঙালীর আশঙ্কা—চিড়িয়াখানা-ভিক্টোরিয়ায় ঘোরা কিংবা কড়াইশুঁটি-নলেনগুড়ের এত সুখ কপালে সইবে তো? স্নেহের স্বভাবই ওই, অকারণে অমঙ্গল আশঙ্কা করে!

জাপানী বুদ্ধি

নিউক্লিয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নতুন মন্ত্রণাদাতা জাপানী প্রধানমন্ত্রী হুকিও হাতোয়ামা। গত ২৮ ডিসেম্বর মনমোহনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রাজধানীতে দাঁড়িয়ে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর পরমাণু চুক্তিতে যাচ্ছে জাপান। এটা রোগের (মানে ভারত-জাপান সম্পর্ক) না ওষুধের (মানে কূটনীতি) লক্ষণ-সেটা বুঝতে কালঘাম ছুটছে কূটনীতিবিদদের।

মর্মান্তিক তিমি মৃত্যু

মানুষের মৃত্যুই সবসময় দুঃখজনক হয় না, কখনও কখনও প্রাণীর মৃত্যুও অত্যন্ত মর্মান্তিক হতে পারে। এই কথাটা ভালভাবেই অনুভব করল নিউজিল্যাণ্ডের এক উপদ্বীপবাসীগণ। সেখানে দিনকতক আগে পাইলট তিমি প্রজাতির প্রায় শ'দুয়েক তিমির দল ঢুকে পড়েছিল। আটকা পড়ে মারা যায় দেড়শোটি তিমি। বাকি ৪২টিকে উদ্ধার করেন সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা। ২৬ ডিসেম্বর মুক্তি দেওয়া হয় তাদের।

তথ্য জানায় গ্যাঁড়াকল

কেন্দ্রীয় তথ্য নিগম (সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন) তাদের নতুন আইনে বলেছে সংসদীয় কমিটির যাবতীয় রেকর্ড তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট) আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংসদে তা পেশ করার পরেই সেই সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের জানার অধিকার প্রযোজ্য হবে। সত্যি বাবা কি গ্যাড়াকল!

ভিসা নিয়ে ডিগবাজী

মাস দু'য়েক আগেই কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল, মাল্টি-এন্ট্রি টুরিস্ট ভিসা ফেরত দিতে হবে। দু'মাস নাকি এই ভিসার কার্যকারিতা থাকবে। কিন্তু আমেরিকা আর ইউরোপের চাপে পড়ে সরকার এখন উল্টো গীত গাইছে। গত ২৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিদের আলোচনায় উঠে এসেছে এই নতুন ভিসা নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরী করা নাকি বেশ কঠিন। এরকম ডিগবাজী খাওয়ার কোনও মানে হয়!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জম্মু-কাশ্মীর ঃ নতুন বোতলে পুরানো মদ

তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ইস্যুটি লইয়া দেশ যখন অস্থির ঠিক তখনই কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি খুঁচাইয়া তোলা হইতেছে। কেন্দ্র সরকার কার্যত আগুন লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি কেন্দ্র সরকার এই সুপারিশ স্বীকার করেন তাহা হইলে অন্যত্রও ইহার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইবে। ঘটনা হইল সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রাক্তন বিচারপতি এস সাগহির আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি স্টাডি গ্রুপ কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু-কাশ্মীরের বিষয় লইয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ওই গ্রুপ বা প্যানেলের অন্যান্য সদস্যদের রিপোর্টের বিষয়বস্তুটি যেমন জানানো হয় নাই, তেমনই মূল বিষয়টি প্রসঙ্গে আলোচনাও নাই। মোদ্দা কথা হইল, ইহা অনেকটা নতুন বোতলে পুরানো মদের মতো। ২০০৬-এর মে মাসে গোলটেবিল বৈঠকের পর কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় করিবার লক্ষ্যে জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির নিরসনই ছিল এই স্টাডি গ্রুপ-এর উদ্দেশ্য। খুব স্পষ্ট ভাষায় না জানাইলেও আসলে স্টাডি গ্রুপ জম্মু-কাশ্মীরের জন্য 'স্বায়ত্বশাসন'-এর দাবীই জানাইয়াছে যাহা মূলত শ্রীনগর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠস্বরকেই জোরদার করে। যদিও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি লইয়া উপত্যকার রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। যেমন অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্সের দাবী মোতাবেক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে বোঝায় আজাদী যাহা বিচ্ছিন্নতাবাদিতারই নামান্তর। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে জম্মু-কাশ্মীরের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব কেবল উপত্যকার রাজনৈতিক নেতারা করিতে পারেন না। রাজ্যের মধ্যেই নিজেদের উন্নয়ন ও প্রগতি নিশ্চিত করিবার জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসনের দাবীর কথাটিও খেয়াল রাখিতে হইবে। এই দুইটি এলাকাই শ্রীনগর দ্বারা নিজেদের অবহেলিত বোধ করিতেছে এবং এই কারণেই বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। রাজ্যের মধ্যেই বিবাদাস্পদ বিষয়গুলির মীমাংসা করিবার জন্য বিচারপতি আহমেদ ও তাঁহার দলটিকে নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। এবং একইসঙ্গে কেন্দ্রের সহিত রাজ্যের সম্পর্কের মূল বিষয়টিও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। অথচ সাতাশ মাস অতিবাহিত হইবার পর যাহা প্রকাশিত হইল তাহা লিবারহান কমিশনের রিপোর্টের মতোই পর্বতের মূষিক প্রসব। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের তথ্য দপ্তর রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশ করিয়াছে তাহা যদি মূলানুগ হয় তবে তাহা উপত্যকার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। যাহা এককথায় কাল বাহ্য এবং পুরানো দাবীগুলির কেবল পুনরাবৃত্তি। সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয় হইল চূড়ান্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করিবার আগে ইহার খসড়াটি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয় নাই এবং তাহাদের মতামতকেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বস্তুত অভিযোগ হইল, বিচারপতি আহমেদ গত দুই বছরে একবারও গ্রুপের সদস্যদের কোনও আনুষ্ঠানিক মিটিং ডাকেন নাই। কৌতূহলের বিষয় হইল, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রুপটি গঠিত হইলেও তাহারা রিপোর্টটি জমা দিয়াছেন ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকারের কাছে।

দেখা যাইতেছে বিচারপতি আহমেদের এই সুপারিশগুলি আসলে ইতিপূর্বেকার সেইসব কমিটি ও কমিশনের নির্দেশিত বিভিন্ন সুপারিশের সমষ্টিমাত্র যেগুলি আন্তঃরাজ্য দাবীগুলি এবং স্বায়ত্বশাসনের মীমাংসা করিতে গঠন করা হইয়াছিল। অধিকাংশ সুপারিশেরই বর্তমানে আর কোনও কার্যকারিতা নেই। যেমন 'কাশ্মীর চুক্তি' (কাশ্মীর অ্যাক্ট) প্রসঙ্গটি কিংবা ১৯৫৩ সালের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাবটি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অবাস্তব চিন্তা ভাবনা। জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর অধিকারের অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না যাহা পিডিপি-র স্মরণে থাকা দরকার ছিল। জম্মু-কাশ্মীর এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসিত হয়—বহিরাগতদের দ্বারা নয়। জম্মু-কাশ্মীর সম্বন্ধে যেসব সুপারিশ আগে ও এখন করা হইয়াছে, সেখানে জম্মু ও লাদাখ অঞ্চলের মানুষের যথাযথ অভিযোগগুলি সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচারে কয়েক লক্ষ কাশ্মীরী পণ্ডিত উপত্যকা হইতে পালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং স্বদেশেই উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করিতেছেন, তাহাদের বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্ব দিয়া বিচার-বিবেচনা করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জম্মু-কাশ্মীরের মূল ইস্যুগুলির বিষয়ে এই সুপারিশে কোনও সদর্থক ভাব-ভাবনার সন্ধান নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব সব একসূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের একটি সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাঙ্গালা দোয়েলের কূজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাঙ্গালার সাহিত্য কুঞ্জ সরস হইবে। এক কথায়, এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন একখানি মনোরম বজরা গড়িতে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানী করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, কালে-অনন্তকালের তুলনায় অতি অল্পকালের মধ্যে-ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত একাত্মপত্র সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হইবে।

—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরকারী মদতে এক লুণ্ঠনের কাহিনী

দেবব্রত চৌধুরী

'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন' নামের সংস্থাটি বৃটিশ মালিকানায় ১৮৯৭ সালের ৩০শে মার্চ জন্ম নেয়। ৫ই জানুয়ারী ১৯৭০ সালে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ স্থানান্তরিত হলো লন্ডন থেকে কলকাতায়। আর ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কোম্পানির নামান্তর হলো সি. ই. এস. সি লিমিটেড। অনেক ঝড় সহ্য করেও এই কোম্পানিটি টিকে ছিল সসম্মানে। কিন্তু বিপদের সূচনা ১৯৮৯ সাল থেকে —প্রথম বাম সরকারের কৃপাধন্য আর পি গোয়েঙ্কার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটল বাংলার শিল্প সাম্রাজ্য বিজয় অভিযানে। মাত্র ৫-৬ কোটি টাকার বিনিময়ে হাজার কোটি কোটি টাকার লগ্নী ও সম্পদ করায়ত্ত হল গোয়েঙ্কা বাহিনীর ৮৯ সালেই—তার পিছনে ছিল রাজ্য সরকার তথা মহামান্য রাজ্যাধীশ জ্যোতি বসু।

তারপর শুরু হল পুরানো গামছার মতো বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিংড়ে নেওয়ার খেলা। যখন তখন যা খুশী তাই বিদ্যুৎ এর মূল্যবৃদ্ধি, "মাশুল বৃদ্ধির অপ্রতুলতা"-র জন্য বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির গল্প নেহাতই গ্রাহকদের ধোঁকা বানাবার গল্প।

এখানে একটা মজার জিনিস হলো, উৎপাদিত ইউনিট পিছু জ্বালানি খরচ অনেক বেশী হলেও মোট বিক্রীত ইউনিট জ্বালানি খরচ ভাগ হয়ে গিয়ে নীট ইউনিট পিছু খরচ অনেক কম হয়ে যায়। কারণ সি. ই. এস. সি. বিশাল পরিমাণে বিদ্যুৎ ডি. ভি. সি ও বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে সস্তায় কিনে চড়া দামে বিক্রি করে। বছর বছর এই বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ছে—এই বিদ্যুৎ কেনার জন্য CESC-র জ্বালানি খরচ হয় না। জ্বালানি খরচ মূলত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। কিন্তু নিজেদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ আবার কমে আসছে অথচ কম দরে অন্য সংস্থা থেকে বিদ্যুৎ কিনে জ্বালানি খরচ করেছে—এই গল্প শুনিয়ে গ্রাহকদের থেকে বেশী করে মাশুল নিয়ে নিচ্ছে সরকারি মদতে। মোদ্দা কথা হলো জ্বালানি খরচ যা বাড়ছে তার দ্বিগুণ হচ্ছে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি।

"কয়লা চুরি আর চুরি যাওয়া কয়লার দাম মাশুলের নামে গ্রাহকদের দিতে হবে কেন? প্রতি ইউনিট বিক্রি করা বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৫ পয়সা। এবার জ্বালানি খরচ বাড়ার জন্য জ্বালানী খাতে দ্বিগুণ বেশী খরচ দেখিয়ে বিদ্যুৎ-এর মাশুল বাড়ানো হচ্ছে। তাহলে "মাশুল বৃদ্ধির অপ্রতুলতা"র জন্য বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির গল্প নেহাতই গ্রাহকদের ধোঁকা বানাবার গল্প।"

সীমাহীন জ্বালানি মাশুল—এতদ্‌সত্ত্বেও কোম্পানি নাকি দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়ছে—অলাভজনক হয়ে পড়ছে। তাহলে লাভের গুড় কোন সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে? সরকারি অডিটর থেকে শুরু করে সব রাজনেতারা—তিনি সুপারম্যান নেতা বা অগ্নিকন্যা হলেও সব মাতববরদেরই এক সুর—"সব ঠিক হ্যায়"। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের জন্য "ওইটুকু নষ্টামি মেনে নিতেই হবে। তাতেই আমাদের আখের উজ্জ্বল।" কারণ ভোট যুদ্ধে "গোয়েঙ্কা বাবা" পার করেগা।

তাই ট্রড্রএট্র-তে যা খুশী তাই মাশুলের ফাঁস গ্রাহকদের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য চলছে অলীক অসম্ভব পাটীগণিতের আঁকজোক। অজুহাত হিসেবে বলছে, "কয়লার দাম বেড়ে গেছে" তাই মাশুল বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। কিন্তু কয়লার দাম বেড়েছে ১১ শতাংশ, কিন্তু ইউনিট প্রতি এই বাড়তি মাশুল নিশ্চয় সবটা কয়লার মূল্য বৃদ্ধির জন্য হয়নি। "ডাল মে কালা হ্যায়"—প্রতি মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেখানে আগে লাগত ৭২২ টনের মতোন কয়লা সেখানে এখন লাগছে ৭৭৮ টনেরও বেশী। অর্থাৎ ৫৬ টন বেশী কয়লা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কেন? গ্রাহকদের ঘাড়ে বাড়তি মাশুলের জন্য যতখানি দায়ী কয়লার মূল্য বৃদ্ধি তার চেয়ে দায়ী বেশী কোম্পানীর অকর্মণ্যতা। আসলে কয়লা চুরি আর চুরি যাওয়া কয়লার দাম মাশুলের নামে গ্রাহকদের দিতে হবে কেন? দেখা যাচ্ছে প্রতি ইউনিট বিক্রি করা বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৫ পয়সা। এবার জ্বালানি খরচ বাড়ার জন্য জ্বালানী খাতে দ্বিগুণ বেশী খরচ দেখিয়ে বিদ্যুৎ-এর মাশুল বাড়ানো হচ্ছে। তাহলে

আর এক নষ্টামির খেলা খেলছে ট্রড্রএট্র। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহ করতে গেলে অনিবার্যভাবেই কিছুটা বিদ্যুৎ নষ্ট হয় বৈজ্ঞানিক কারণে। পশ্চিমদেশে এই নষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণ বড় জোর ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ। কিন্তু CESC সরবরাহ ঘাটতি দেখাচ্ছে প্রায় ২০ শতাংশ। অথচ ট্রড্রএট্র সরবরাহ এলাকা অনেকটাই কেন্দ্রীভূত। মূল চাহিদা কেন্দ্রগুলি সন্নিবদ্ধ ও ট্রড্রএট্র উৎপাদন কেন্দ্র সমূহের খুবই কাছাকাছি। মোট এলাকা মাত্র ৫৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেনের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়োজিত দেবকুমার বসু কমিটি স্থির করে দিয়েছিলেন "টি এন্ড ডিলস্' (Transmission & Distribution Loss) 14% ধরেই জ্বালানি খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ ও তজ্জনিত জ্বালানি মাশুলের পরিমাণ স্থির করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে যত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এই কমিটির হিসাবে ঘাটতি ১০ক্ষ থেকে ১২ক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু ট্রড্রএট্র সরবরাহ ঘাটতি প্রায়ই ২০ক্ষ কমিয়ে গ্রাহকদের বোকা বানিয়ে মাশুল বাড়িয়ে নিচ্ছে। CESC-এর কোনও দোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখতে চান না আর কোনও সরকারি আমলা এমনকী কোনও মন্ত্রী যদি ট্রড্রএট্র-র স্বার্থে বাধা দেন তবে রাজ্য সরকার তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেও দ্বিধা করেন না। যেমন করা হয়েছিল বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও বিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল শিক্ষাবিদ শঙ্কর সেন মহাশয়কে। ক্যাডার দিয়ে তাঁর মেয়েকে হুমকি দেওয়া, হত্যার ভয় দেখানো—নানাভাবে অপমান করে শঙ্কর সেনকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। কিন্তু CESC এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যোগসাজশে রাহাজানি অথবা দিনদুপুরে ডাকাতি করছে গ্রাহকদের উপর।

১৯৮৯-এর ৫ই এপ্রিল CESC মাত্র ১৭ শতাংশ শেয়ার কিনে রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা কোম্পানির দখল নেন। কাগজে-কলমে শেয়ার এবং লোনের বেশীরভাগ অংশই সরকারি নিয়ন্ত্রণে তবু সরকার বিনা বাক্যব্যয়ে এই দখলদারি মেনে নিয়ে তাকে সাহায্য করলেন। শেয়ার কিনতে গোয়েঙ্কাদের মোট খরচ হল ৫ কোটি টাকার মতো এবং এই ৫ কোটি টাকার জোরে হাজার কোটি টাকা পুঁজির সম্পদের উপর ওদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলো। কোম্পানির দখলে আসার মাত্র একমাস বাদে ১৯৮৯-এর মে মাসে সরকার ঘোষণা করলেন লগ্নী টাকার উপর ১২ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ লাভ করা যাবে। সেই লাভের পরিমাণ বজায় রাখার জন্য গোয়েঙ্কাবাবু বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারবে।

সরকারি কৃপাধন্য সংস্থা ১৭ শতাংশ শেয়ারে মালিকের হাতে পরপর তুলে দেওয়া হলো লোভনীয় অনেক প্রকল্প বিনা মূল্যে বা অল্পমূল্যে যথা,—(১) টিটাগড় প্রকল্প তুলে দেওয়া হল ৩০ কোটি টাকায়, (২) বিনামূল্যে কসবার দুটি গ্যাস টারবাইন দিয়ে দেওয়া হলো, (৩) বিদ্যুৎ পর্ষদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন তৈরির কাজ দেওয়া হলো গোয়েঙ্কাজীকে, দিয়ে দেওয়া হলো বজবজ প্রকল্পও। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৯৭ সালের বাজেট অধিবেশনে প্রদত্ত বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেনের ভাষণে জানা যায় যে, যেখানে সরকারি প্রকল্পে মেগাওয়াট পিছু খরচ ৩.৬০ কোটি টাকা, গোয়েঙ্কা কোম্পানী সেখানে খরচ দেখাচ্ছে ৪.৭০ কোটি টাকা। এখানেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল যেভাবে গোয়েঙ্কাদের আবদার মানা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে এক ইউনিটে গ্রাহকদের দাম বাড়বে ৪ টাকার মতন। এতদ্‌সত্ত্বেও ট্রড্রএট্র কোম্পানির তুঘলকী কাজের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে না কোনও দলের নেতা ও নেত্রী যদি তিনি বাংলার অগ্নিকন্যা হনও। ট্রড্রএট্র-র অডিটে নানা খাতে ভুয়া হিসেব দেখানো হয়, যেমন কোনও এক গ্যাঞ্জেস সুগার মিলকে ৮৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ১২৫ টাকা ধার দেওয়া হয়েছে। (যা কোনও দিন ফেরত পাওয়া যাবে না) গোয়েঙ্কাজীর বসতবাটীর বাগান সাজানো ইত্যাদির জন্য বাৎসরিক খরচ দেখানো হয়েছে ৩০ লক্ষ ২ হাজার ১৫২ টাকা। এমনই অসংখ্য খরচ দেখানো হয় যা দেখে মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলিকে খুশী রাখার জন্য খরচ। আর জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে—এরকম গল্প বলে গ্রাহকদের গলা কাটা হচ্ছে—কে করবে প্রতিবাদ?

বিজেপির নতুন যুব সভাপতি

তারক সাহা।। ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়ছে—'old order changeth yeilding place to new.' কালের নিয়মে একদিন সরেই যেতে হয় পুরাতনদের, তার সেই স্থান দখল করে নেয় নতুনরা। প্রকৃতির সেই নিয়ম মেনেই সরে যাচ্ছেন প্রাক্তনরা। বাজপেয়ী, আদবানী, মুরলী মনোহর যোশী প্রমুখেরা সরে গেছেন। তবে ভুললে চলবে না এঁরা কেউই ব্রাত্য নন। এঁদের ভূমিকা বাড়ীর বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মতো। এঁদের অভিজ্ঞতা নিয়েই চলে সংসার, দুনিয়া।

হ্যাঁ, এঁদের হাত থেকেই রাজদণ্ড হাতে নিলেন ৫২ বছর বয়সী নীতিন। সময়টা একটু কঠিন ঠিকই। লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়, নেতাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি, একদা শৃঙ্খলাবদ্ধ দলের এমন পরিণতি বিজেপির পরম শত্রুও ভাবতে পারে না। অথচ হয়েছে, হচ্ছে।

নীতিনজী-র বয়স ৫২। সাধারণ ক্ষেত্রে বয়সটা খুব একটা নবীন না হলেও রাজনীতির ময়দানে এই বয়সটা নবীন-ই। এই বয়সে এমন গুরুদায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন। আদ্যন্ত নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক রাজনৈতিক ময়দানে একেবারেই নবীন এমনটা বলা যাবে না। ১৯৯৫-'৯৯—এই সময়কালে নীতিনজী মহারাষ্ট্রে সেনা-বিজেপি জোট সরকারের পি ডবলু ডি মন্ত্রী ছিলেন। মুম্বাইয়ে তিনি সড়ক মন্ত্রী হিসেবে অধিকতর পরিচিত। তাঁর অন্যতম কারণ হলো মুম্বাই-পুনে এক্সপ্রেসওয়ে তিনি বানিয়ে দেন নির্ধারিত বাজেটের অর্ধেক খরচে। তাঁর সময়কালে বাজপেয়ীজীর সড়ক যোজনায় মুম্বাইয়ে স্বল্পকালের মধ্যে ৫৫টি উড়ালপুল বানিয়ে দেন। নাগপুরেও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি হয় তাঁরই আমলে। এহেন করিতকর্মা মানুষকে বাজপেয়ীজী ডেকে নেন তাঁরই পরিকল্পিত প্রধানমন্ত্রী সড়কযোজনা কর্মসূচীকে রূপ দিতে।

মারাঠিদের কাছে তিনি 'রাস্তার মানুষ' হিসেবে পরিচিত। দেশের অন্যপ্রান্তে অল্প পরিচিত হলেও নীতিনজীর আক্ষেপ যে, পুরো মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামকে পাকা রাস্তায় মুড়ে দিতে পারেননি তাঁর মাত্র চার বছরের সময়ে। তিনি প্রায়ই জন কেনেডির বক্তব্য উদ্ধৃতি দেন—"Roads in America are not good because America is rich, America is rich because her roads are good."

সভাপতি হবার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নীতিই নতুন করে বললেন, তিনি জাতপাতের লড়াইয়ের উর্দ্ধে। তিনি মুসলিম বিরোধী নন। তবে তিনি বলপূর্বক, প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের বিরোধী। যে কোনও ধর্মান্তরকরণ হোক হৃদয়ের আকুতি থেকে। তিনি মনে করেন যে, মুসলিম তোষণ করে, ২০০১ সালে ঘৃণ্য, ভয়াবহ সংসদ আক্রমণের সাজাপ্রাপ্ত আসামী আফজল গুরুকে শাস্তিদান না করে কংগ্রেস ভোট-ব্যাংকের রাজনীতি করছে।

দল হিসেবে আমরা সেই সব মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করি যারা আমাদের শত্রু পাকিস্তানের সমর্থক, সহানুভূতিশীল। কিন্তু আবদুল কালামের মতো মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা দেশকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি।

একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা গাড়কারিজীর রাজনৈতিক প্রেরণা পান তাঁর মার কাছ থেকে। একেবারে বালক বয়সের স্বয়ংসেবক ধীরে ধীরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান। বাণিজ্য শাখায় স্নাতকোত্তর, আইনবিদ্যায় স্নাতক গাড়কারি আদতে শিল্পপতি। তিনি মনমোহন-আর্থিক নীতির-ই সমর্থক। নিজস্ব অভিমত হলো সরকার কখনই ব্যবসা করবে না। উড়োজাহাজের ব্যবসা থেকে সরকারের নিজেকে সরিয়ে রাখাটাকে শ্রেয় বলে মনে করেন নীতিন। একজন কৃষিজীবী বর্তমানে দুটি চিনিকলের কর্ণধার মনে করেন সরকার ৭০ হাজার কোটি টাকায় উড়োজাহাজ না কিনে সেই টাকায় গ্রামে গ্রামে পানীয় জল, রাস্তা, স্কুল নির্মাণ করতে পারে না? উড়ান শিল্পকে সরকার বেসরকারী করে দিন। কেন, আমরা সস্তায় টেলিব্যবস্থা পাচ্ছি না টেলি শিল্পকে প্রাইভেটের হাতে ছেড়ে দিয়ে?

তথাকথিত আধুনিক সাংবাদিকরা তাঁকে রক্ষণশীল মনে করে যখন তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমালোচনা করেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বলে অভিহিত

করেন। আমরা এই সংস্কৃতির ধারক-বাহক যা আমরা বাপ-ঠাকুর্দা-র কাছ থেকে পেয়েছি। ঔরঙ্গজেবের ধ্যান-ধারণা আমাদের উত্তরসূরীদের শিক্ষা দিতে পারি না বরং আমাদের কিছু কিছু সদ্‌গুণ আছে যা আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের কাছে তুলে ধরবো।

সাংবাদিকদের চোখে তিনি মধ্যপন্থী। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বরাবরই উদারমনস্ক। নির্মাণ শিল্পে তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সমর্থক। নির্মাণ শিল্পে তিনি জাপান-জার্মানির প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চান। যা আজ দেশের প্রতিটি মেট্রো শহরে ব্যবহৃত হচ্ছে। আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ না করে বরং দক্ষতার সঙ্গে অডিট করা উচিত বলে মনে করেন নীতিন। তাঁর না-পসন্দ হল অকর্মণ্যতা।

গাড়কারি জানেন তিনি কী বলছেন। ১ লক্ষ টাকা দিয়ে কারবার শুরু করে ৫০০ কোটি টাকার মালিক নীতিনজী ক্ষমতা চলে যাবার পর একটি চিনি কল কেনেন এবং পরে আরেকটি কেনেন। বিদর্ভ অঞ্চলে তাঁরই চিনি কল চলছে যাঁর কারণ হচ্ছে সুনাম। একুশ শতকের মূলধনই হল সুনাম, সততা আর দক্ষতা।

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, লোকে জানে সড়ক মন্ত্রী হিসেবে তাঁর অবদানের কথা। বর্তমানে তিনি তাঁর চিনি কলের মাধ্যমে মুম্বাইয়ে প্রতিমাসে ১৬ কোটি টাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর আরও বক্তব্য হল যে, তাঁর চিনিকল মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার লিটার ইথানল, তিন হাজার লিটার বায়োডিজেল উৎপন্ন করে। নাগপুরে তাঁর পেট্রোল পাম্প রয়েছে যা দিয়ে তিনি ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বেচেন। তাঁর আশা একদিন এদেশের চাষীরা দেশকে শক্তির জোগান দেবে।

এমন উৎসাহী 'শক্তির উৎপাদক', মিষ্টি বিতরণকারী গাড়কারিজী সভাপতি হিসেবে সমস্যাসঙ্কুল বিজেপিকে কতটা চাঙ্গা করতে পারবেন ভবিষ্যৎই কেবল তা বলতে পারে।

বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্মেলন

(২ পাতার পর)

শ্যাম মোগা-ও।

শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকরণ—এটাই ছিল পরিষদের রাজ্য সম্মেলনের মূল অ্যাজেন্ডা। রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মন্ডল জানালেন—"এগুলো নিয়ে আলোচনা তো হয়েছেই, বর্তমান পরিস্থিতি ও শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে দুটো প্রস্তাবও পাশ হয়েছে। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানাহানি নিয়ে। আগামী ৭ই জানুয়ারী এ ব্যাপারে আন্দোলনে নেমে 'দাবী দিবস' পালন করব আমরা।" রাজ্য সভাপতি রবি রঞ্জন সেন পরিষদের প্রাদেশিক কর্মসমিতির যে দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন তাতে অজস্র নতুন আর নবীন মুখের সারি। আর এই অগণিতের ভিড়ে বঙ্গের ছাত্রসমাজকে নেতৃত্বদান করতে পুরোপুরি প্রস্তুত বিদ্যার্থী পরিষদ।

সঙ্ঘের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে

(১ পাতার পর)

বাড়ছে—সাধারণ মানুষের কাছে, সজ্জন শক্তির কাছে, এমনকী সংবাদ মাধ্যমের কাছেও। গত ৮৫ বছরে সঙ্ঘকে বহু বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়েছে (তিনবার সরকারি নিষেধাজ্ঞাসহ)। কিন্তু এখন সঙ্ঘের ভাব-ভাবনার উপর আস্থা বাড়ছে।

ইতিমধ্যে সেবিকা সমিতির শিবিরে আমাদের গাড়ী ঢুকে গেছে। কাজ যাই হোক না কেন, কাজে কতটা মহত্ত্ব দিচ্ছি সেটাই আসল—সেবিকাদের সামনে এ নিয়ে যে গল্পটা বললেন, সেটা তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না।

তিনজন যুবক। লেখাপড়া শিখে ইঞ্জিনিয়ারিং ভালোভাবে পাশও করেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনও কাজ জোটাতে পারছে না। শেষমেশ অবশ্য একটা পাথর-কাটা কারখানায় খুব কম মাইনেতে তারা চাকরি পেল। মাস তিনেক কেটে গেছে। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক এসে প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করল—কি হে, তোমার কাজ কেমন লাগছে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রথমজন বলল, কী আর বলবো, ভাগ্য খোঁজার কাজ করছি। লেখাপড়া শিখে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর কী না এই কাজ!

কিছুদিন পর দ্বিতীয়জনের কাছে গিয়ে ওই লোকটা সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল। দ্বিতীয়জন কিন্তু একটু অন্যরকম কথা বলল—ভালোই লাগছে। এখন যে পাথর কাটছি, সেটা দিয়েই তো একটা ভালো বাড়ী হবে। পাথরগুলো তাই খুব যত্নের সঙ্গে কাটতে হচ্ছে।

তৃতীয়জন বলল, যে পাথর কাটছি তা দিয়ে এখানে একটা মন্দির হবে। সেই মন্দিরের বিগ্রহও এই পাথর দিয়ে তৈরি হবে। তখন কত লোক এই বিগ্রহকে দেখে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পূজা করবে। তখন এই বিগ্রহ যে তৈরি করেছে তার শিল্পীর নাম হয়তো জানবে না, কিন্তু তার কীর্তির প্রশংসা করবে। তাই মন ঢেলেই পাথর কাটছি।

মালিকের কাছে এই তিনজনেরই কাজের রিপোর্ট গেল। মালিক প্রথমজনকে একটা ভালো মাইনের চাকরি জুটিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়জনকে নিজের কারখানাতেই চীফ আর্কিটেকচার নিযুক্ত করলেন। আর তৃতীয়জনকে পুরো প্রকল্পটারই দায়িত্ব দিয়ে বললেন, আপনিই এই পদের উপযুক্ত।

তাই কাজের প্রকার নয়, কাজটাকে কিভাবে দেখছি সেটাই মহত্ত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গই নিরাপদ আশ্রয়স্থল

(১ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে এবং সারা ভারতে তাদের সন্ত্রাসের জাল বিছিয়ে চলেছে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো সম্প্রতি লালচীন ভারতে অন্তর্ঘাত চালাতে পুরো মদত দিচ্ছে। অবাক হবো না যদি শুনি মাওবাদী—জেহাদি জোট হয়েছে। যারা চীনের চেয়ারম্যানকে অনায়াসে ভারতের চেয়ারম্যান বলতে পারে তারা চীন থেকে লাল সংকেত পেলেই রাতারাতি জেহাদিদের ভাই-ভাতিজা বনে যাবে। অরুণাচল ও লাদাখ দখলে চীনের আগ্রাসী নীতি এবং সারা দক্ষিণ এশিয়াকে মোল্লাতন্ত্রের অধীনে আনার জেহাদ ২০১০ সালে সবচেয়ে বড় বিপদ।

পশ্চিমবঙ্গকে সদর দফ্‌তর করে সারা ভারতে জেহাদি কার্যকলাপ ছড়িয়ে দেওয়ার গোপন পরিকল্পনা যে চালু আছে তার প্রমাণ ২০০৯ সালে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। গত বছরের ১২ জানুয়ারি মালদা থেকে সফিক ইলিয়াস নামে এক যুবককে সি আই ডি গ্রেফতার করে। সে দীপক নামে স্থানীয় এলাকায় পরিচিত ছিল। গ্রেফতারের পর জানা যায় সে বাংলাদেশের রাজশাহীর বাসিন্দা এবং লশকর-এ-তৈবার একজন সক্রিয় জেহাদি। লশকরের তরফে সে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চলাচলের উপর নজর রাখার দায়িত্বে ছিল। সফিক তার জবানন্দিতে জানায় চরবৃত্তির জন্য আরও দুই লশকর জেহাদিকে সে গোপনে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়েছে। এই দুই সন্ত্রাসবাদীর একজন সিকান্দার আজমকে গত বছর জুন মাসে জম্মু-কাশ্মীরে গ্রেফতার করা হয়। দ্বিতীয় জেহাদি আজও অধরা আছে।

এরপর ৬ মার্চ কলকাতা পুলিশ লশকরের বোমা ও বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ আবু তাহেরকে শিয়ালদহ স্টেশনে গ্রেফতার করে। এই আবু-তাহের ওরফে মহম্মদ জাকারিয়াও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা এবং লশকরের বাংলাদেশ শাখার প্রধান আবদুল করিম তুন্দার ডানহাত বলে পরিচিত। তাহের তার স্বীকারোক্তিতে জানায় যে ১৯৯৭ সালে দিল্লী, লুধিয়ানা এবং রোহতকে সে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সহজেই কলকাতা-মুর্শিদাবাদ রুটে বাংলাদেশে চলে যায়। এরপর বাংলাদেশের লশকর প্রধান তাকে পাকিস্তানে লশকরের সদর দফতরে পাঠায় অন্তর্ঘাত চালানোর বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য। তাহেরের দায়িত্ব ছিল মারাত্মক আর. ডি. এক্স বিস্ফোরক বাংলাদেশ থেকে উত্তরপ্রদেশে চালান দেওয়া। কাজটা সহজেই সে করেছে। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে সে আর. ডি. এক্স নিয়ে শিয়ালদহে নেমে উত্তরপ্রদেশগামী ট্রেনে চড়ে বিনা বাধায় বহু বছর যাতায়াত করেছে। ১৯ মার্চ মহাকরণের কাছে ঘোরাফেরার সময় ধরা পড়ে পাক জেহাদি গোষ্ঠি অল-বদরের জঙ্গি শাহনওয়াজ ইসমাইল নামে বছর ২৭ বয়সের এক যুবক। সে এক সময় 'পাকিস্তান রেঞ্জারস্' বাহিনীর সদস্য ছিল। সে করাচি থেকে বাংলাদেশের ঢাকায় আসে। এরপর রাজশাহী থেকে গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে সে ১৮ মার্চ মালদায় আসে। মালদা থেকে সড়ক পথে লালগোলা এবং সেখান থেকে ট্রেনে ১৯ মার্চ সে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছয়। কথা ছিল, তাহের তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে। তার জানা ছিল না যে তাহের আগেই গ্রেফতার হয়েছে। তাহেরের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ ইসমাইলকে ধরে। ইসমাইলের দায়িত্ব ছিল কাশ্মীরে আল বদরের জঙ্গিদের সক্রিয় করা।

৫ এপ্রিল লালগোলায় ধরা পড়ে শাহনওয়াজ ওরফে চন্দন। তাহের ধরা পড়ার পর লশকর তাকে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাঠিয়ে ছিল। শাহনওয়াজকে জেরা করে জানা যায় যে বাংলাদেশের 'হুজি' সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠি ভারতে হামলা চালাতে লশকরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। শাহনওয়াজকে জেরার পর জানা যায় হুজির প্রথম সারির জঙ্গি মুফতি ইব্রাহিম উত্তর ২৪ পরগণার বাগুইহাটিতে আত্মগোপন করে বাস করছে। এই মুফতি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। সে বাংলাদেশ হুজি-র প্রধান মুফতি আবদুল হান্নানের ভাইপো। ১২ এপ্রিল রাতে বাগুইহাটির অশ্বিনীনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গত বছরে গ্রেফতার হওয়া ইসলামি জঙ্গিরা সকলেই স্বীকার করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে তারা যতটা নিরাপদে বাস করে ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে তারা ততটা নিরাপদ নয়। পশ্চিমবঙ্গেই তারা অসমের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠি এবং মাওবাদীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে। এই রাজ্যে বসেই তারা সারা ভারতে লাগাতার নাশকতা চালানোর যৌথ ছক তৈরি করে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার বামফ্রন্ট

নিশাকর সোম

বিগত সংখ্যায় এই কলামে ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে ছাত্রব্লকের প্রাক্তন নেতা তথা বর্তমানে আইনজীবী জনৈক ভট্টাচার্য-এর উক্তির উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের অল ইন্ডিয়া ১৬তম পার্টি কংগ্রেসের বক্তা কেশব ভট্টাচার্য। এই সব কথা তিনি শুধু পুনরুক্তি করেননি, আরও বলেছেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে সিপিএম-এর দালাল সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে হাফিজ সাইরানি পার্টি কংগ্রেসের দিন গোপনে রাত্রিতে কেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গেছলেন? এর ফলে সম্মেলনে বিরাট হইচই সৃষ্টি হয়। একসময়ে দেবব্রত বিশ্বাস-কে রেগে ধমক দিতে হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা বলেন, সিপিএম ফরওয়ার্ড ব্লককে গিলে খেতে চায়। শুধু ফরওয়ার্ড ব্লক নয়, আর এস পি এবং সিপিআই পার্টিকেও গ্রাহ্য করে না। কেন্দ্রীয় স্তরে চার পার্টির যথা—সিপিএম, সিপিআই, আর এসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যে সমন্বয় কমিটি সেটি সিপিএমের হুকুমে চলার নির্দেশ দানের স্থান ছাড়া কিছুই নয়। এই সভার সমালোচনার ফলেই অর্থাৎ সিপিএম-বিরোধী গোষ্ঠীর চাপে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব মেনে নেয় যে সিপিএম বামফ্রন্টের অগ্রগতি ধ্বংস করে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নীতি মানে না সিপিএম নেতৃত্ব। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াবে। সিপিএম-এর নেতৃত্ব বদল হবে কিনা—সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু সিপিএম-এর নীতির পরিবর্তন দাবি করছে ফরওয়ার্ড ব্লক।

ফরওয়ার্ড ব্লক মাওবাদীদের বামপন্থী বলে মনে করে। উল্লেখ্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলনে মাওবাদী নেতা কিষেণজি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এই পার্টি কংগ্রেসে সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদকদ্বয় বক্তৃতা করেছেন। বামঐক্য দৃঢ় করার জন্য আশা ও ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আর এস পি নেতা দেবব্রত ব্যানার্জি বক্তৃতায় বলেছেন—"জঙ্গি" বামঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সেই বামঐক্য নিচের তলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে—সেটা করতে বড় পার্টি রাজি নয়।

এখন সিপিএম নাকি "অভিযোগ শোনার কমিটি" গঠন করছে! এতো আগা কেটে গোড়ায় জল ঢালা। কত অভিযোগ শুনবেন? কম্বলের লোম বাছতে তো গোটা কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে।... সিপিএম কি পারবে প্রকাশ্যে জনসাধারণ-এর কাছে ক্ষমা চাইতে।

ফরওয়ার্ড ব্লকে প্রো-সি পি এম এবং অ্যান্টি-সিপিএম লবী মেরুকরণ হয়েছে। শেষমেশ এই অ্যান্টি-সিপিএম লবী তৃণমূলের দিকে ঝুঁকবেই। এমনকী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই অ্যান্টি-সিপিএম আলাদা পার্টি গড়ে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ মন্ত্রিসভার কাজকে তুঘলকী আচরণ বলে সমালোচনা করাতে একটা "গুজব" (?) চালু হয়েছে যে কিরণময় নন্দের কন্যার সঙ্গে তৃণমূলী অধিকারী বাড়ির কনিষ্ঠের সঙ্গে বিবাহ হতে চলেছে! তবে কলকাতা পুরনির্বাচনে সিপিএম শরিকদের দাবি মেনে নেবে। কারণ সিপিএম-এর কলকাতা জেলা নেতারা মনে করেন যে পুরসভার গদী থেকে সিপিএম-এর বিদায় অনিবার্য। সিপিএম দলের রাজ্য কমিটির মধ্যে তীব্র দলাদলি দেখা দিয়েছে। একটি বর্ধমান গোষ্ঠী—বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, সমর বাওড়া, (বর্ধমান জেলা সম্পাদক) অনিল বসু (হুগলী) ওরফে মানিক রায়। অপরদিকে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য-এর গোষ্ঠীতে আছেন মহঃ সেলিম, ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, অশোক ভট্টাচার্য, সূর্য মিশ্র, রঘুনাথ কুশারী ও অমিতাভ বসু এবং রাজদেও গোয়ালা। আর বিমান বসুও গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তাতে আছেন—অমিতাভ নন্দী, রবীন দেব, অমিয় পাত্র (বাঁকুড়া), শ্রীদীপ ভট্টাচার্য (হাওড়া)। বিমান বসু অমিয় পাত্র এবং শ্রীদীপ ভট্টাচার্যকে রাজ্য-পার্টির প্রধান আন্তঃপার্টি প্রচারক করেছেন। আর রবীন দেবকে নানা সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য-নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছেন। বলাইবাহুল্য বিমানদার একনিষ্ঠ ভাই সুবীর ব্যানার্জি তো বিমানবাবুর পক্ষে সরব। যদিও সাক্ষরতা সমিতিতে সুবীর ব্যানার্জিকে ব্যর্থ সাধারণ-সম্পাদক বলা হয়। এদিকে আর এক গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। তাঁরা হলেন বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয়-শ্যামল হঠাও অভিযানের পুরোধা। এই গোষ্ঠীর প্রধান বক্তা হলেন রেজ্জাক মোল্লা। তিনি নিজ এলাকায় পঞ্চায়েত উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মহাকরণে বসে বলেছেন— "পার্টি আপাদমস্তক ভেজালে ভরে গেছে। তথাকথিত শিক্ষিতদের নয়—গরীব কম শিক্ষিতদের সামনে আনো। সাদা চুল হঠাও, কালো চুল আনো। তবে পার্টির উন্নতি হবে। শিক্ষিত সাদা পোশাক, সাদা চুল এনে পার্টির উন্নতি হবে না।"

রেজ্জাকের এই উক্তির সমর্থনে তিনি বলেছেন, যে পার্টির শুদ্ধি করণের দলিলের বাইরে তিনি কিছুই বলছেন না। দলিলের মধ্যে এ-সব ব্যাখ্যা আছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকে প্রো-সি পি এম এবং অ্যান্টি সিপি এম লবী মেরুকরণ হয়েছে। শেষমেশ এই অ্যান্টি-সিপিএম লবী তৃণমূলের দিকে ঝুঁকবেই। এমনকী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই অ্যান্টি - সিপিএম আলাদা পার্টি গড়ে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে।

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় সভায় তৃণমূল-কে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন সভার যোগদানের জন্য। তৃণমূল তথা বিরোধী নেতা পার্থ চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, "না"। এটাইতো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কারণ এই অহংকারী উদ্ধত মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে বলেছিলেন, "আমরা ২৩৫ ওরা..."। তিনি আরও বলেছিলেন যে-আমার শুধু মার খাব না—মারের প্রতিরোধ করবো।" এর ফলেই আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ সিপিএম-নেতৃত্বের অহংভাব-ঔদ্ধত্যের জন্য সিপিএম নিঃসঙ্গ। বামফ্রন্টের মধ্যেও সিপিএম নিঃসঙ্গ এবং বিশ্বাসহীনতায় ভুগছে। এখন বুদ্ধদেববাবুকে প্রকাশ্যে বলতে হবে—"আমি বিরোধীশক্তিকে দম্ভ দেখিয়ে অন্যায় করেছি। আসুন আমরা একসাথে কাজ করি।"

উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কলামে বারবার লেখা হয় যে, সর্বদলীয় সভা করা হোক। বুদ্ধ বাবু তথা সিপিএম-এর মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গ তাদের পৈত্রিক জমিদারি নয়, তাদের ক্রীতদাস নয়। অহংকারের দম্ভে তখন টের না পেলেও পশ্চাতে কাঁদতে হচ্ছে তাই অঝোর ঝরে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বুদ্ধ বাবু যদি শুধু বিধানসভা দেখে সর্বদলীয় সভা ডাকেন তো ভুল হবে। বিধানসভায় যাঁদের সদস্য নেই, যেমন বিজেপি— এদেরও সর্বদলীয় সভায় ডাকতে হবে।

এখন সিপিএম নাকি "অভিযোগ শোনার কমিটি" গঠন করছে! এতো আগা কেটে গোড়ায় জল ঢালা। কত অভিযোগ শুনবেন? কম্বলের লোম বাছতে তো গোটা কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে।

সিপিএম কি পারবে প্রকাশ্যে জনসাধারণ-এর কাছে ক্ষমা চাইতে। এ-ছাড়া কোনও ভাবেই সর্বদলীয় সভার সফলতা আসবে না। অহংকারের মণিমালা ফেলতে হবে পথের ধূলায়।

হস্তিনী দিদিমণি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হেডলাইন'টা দেখে ঘাবড়ে গেলেন নাকি? কেন হাতিদের কি মানুষ হতে নেই? মানে হাতিরা আবার দু'পেয়ে মানুষ হবে কি করে—একদম ঠিক কথা। কিন্তু জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'মানুষ চেনা'র দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর মনুষ্য সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—মান ও হুঁশ থাকলেই মানুষ। হাতিদের যে ওই দুখানি জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে আছে তা দিব্যি বোঝা গেল নাগরাহোল ন্যাশানাল পার্কে। তবে এটা বুঝতে গেলে একটি প্রচলিত ধারণা আপনাকে পাল্টাতে হবে। কুনকি হাতিদের সম্পর্কে অনেকেরই যেটুকু জ্ঞান রয়েছে যে এই প্রকারের হাতিরা মাদীহস্তিনী হয় এবং কোনও হাতিকে ধরতে গেলে এদের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কর্নাটক, কেরল আর তামিলনাড়ু—ভারতবর্ষের দক্ষিণাপ্রান্তে এই তিনটে রাজ্যজুড়ে অবস্থিত নাগরাহোলের জঙ্গলে এলে আপনার ধারণাটা পাল্টাতে বাধ্য।

নাগরাহোল ন্যাশনাল পার্কে হাতির ট্রেনিং হচ্ছে।

এই জঙ্গলে হাজার ছ'য়েক এশীয় প্রজাতির হাতি রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি রয়েছে কুনকী হাতি। কর্নাটকের বনদপ্তর যাদেরকে 'শিক্ষিকা' বলতেই অভ্যস্ত। এদের যত্ন নেয় মাহুতরা। এদের যত্ন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ বন্য হাতিরা প্রায়শঃই ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। ধান ও অন্যান্য শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয় তাতে। এইসব হাতিদের 'মানুষ' করতে ওই শিক্ষিকা হাতিদের ভূমিকা অপরিসীম। গত দু' বছর ধরে তারা এই কাজেই ব্যাপৃত। তবে হস্তিনী দিদিমণিদের কাছে 'অবাধ্য ছাত্র-ছাত্রীদের' ধরে আনার প্রাথমিক কাজটা বনদপ্তরের কর্মীদেরই করতে হয়। তাদের 'ডোড্ডি' বলে একটি কাঠের খাঁচায় প্রথমে পোরা হয়। একাজে প্রশিক্ষিত ওই 'কুনকি' হাতিগুলি বনদপ্তরের কর্মীদের পর্যাপ্ত সাহায্য করে। ওই সময় এদের কাজ ধরা পড়া হাতিগুলির বন্যতা হ্রাস করা। বন্যতা হ্রাস মানে জংলী হাতিগুলির অবাধ্যতাকে কমিয়ে আনা। এই 'কমিয়ে' আনার পরেই শুরু হয় আসল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের সময়সীমা প্রধানত দু' বছরের। তবে ফেল-টেল করলে এই সময়সীমা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই দিদিমণিদের ট্র্যাক রেকর্ড দারুণ ভাল। ফেল করা 'ছাত্র-ছাত্রী'দের সংখ্যা নেহাত-ই কম। এমনকী স্কুল-ছুটও নেই বললেই চলে। ৫০০০ বর্গ কিমি নাগরাহোল বনাঞ্চলে হাজার ছ'য়েক হাতি অথচ দিদিমণি মাত্র তিন-জন। এস এস সি (মানে স্কুল সার্ভিস কমিশন) নাকি সি এস সি (মানে কলেজ সার্ভিস কমিশন) ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

‘জলবায়ু-উদ্বাস্তু’ বাংলাদেশীরা ভারতে ঢুকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একবিংশ শতাব্দীর এক নতুন শব্দ ‘জলবায়ু-উদ্বাস্তু’। অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় নিয়ে তটবর্তী এলাকা থেকে শহরাঞ্চলে চলে আসছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। বলা-বাহুল্য জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত বাংলাদেশীরা (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমানরা) মওকা বুঝে পার্শ্ববর্তী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঢুকতে শুরু করেছে। এজন্য সরকারিভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ভারত ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারাক্রান্ত। তার মধ্যে রয়েছে কয়েক কোটি বিদেশী-উদ্বাস্তু ও বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা।

এবার অনুমান মোতাবেক ধীরে ধীরে বাংলাদেশের উপকূল এলাকার মানুষেরা ভারতকেই পাকাপোক্ত বাসস্থান বানাবে। ২০০৯-এর আয়লায় পশ্চিমবঙ্গের থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বাংলাদেশে। দেশ-বিদেশ থেকে সাহায্য এলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। তখনকারই খবর হলো যে, ব্যাপক সংখ্যায় বাংলাদেশীরা ঢাকা এবং ভারতে চলে এসেছে খুলনা থেকে। এখানে বলা বাহুল্য, ঢাকা ইতিমধ্যেই জনভারে ভারাক্রান্ত। সেখানে খুলনাবাসীরা জায়গা পেতেই পারে না। সেজন্য তারা লাগোয়া অসম ও পশ্চিমবঙ্গে আসছে এবং আসবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বি বি সি’র সংবাদে প্রকাশ যে বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রীরা তাদের দেশের উপকূলবাসীদের ভারতে ঢুকতে শুধু উৎসাহিত করছেনই না, উপরন্তু মন্ত্রীরা দাবী করছেন, বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত ও উদ্বাস্তু জনসংখ্যাকে পাশাপাশি দেশকেই জায়গা করে দিতে হবে। এই গণহারে জনপাচারের কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে বাংলাদেশে এমনকী একটি সেলও গঠিত হয়েছে। আইনুল নিশাত নামে জনৈক সিনিয়র ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডভাইসর ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান-২০০৯’ শীর্ষক একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছেন।

আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে পাড়ি

ওই আইনুল নিশাত সাহেব সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, “শুধু জলবায়ুর পরিবর্তনই নয়, নদী-ক্ষয় ও ভূমিক্ষয়ের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ ঘর-বাড়ি ছাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা প্রথমে দেশের ভিতরেই কোনও জায়গায় আসবেন, তারপরে দূরে-বহুদূরে চলে যাবেন।” বলতে দ্বিধা নেই দূর বহুদূর আর কোথাও নয়—কেবলমাত্র ভারতবর্ষ। কেননা, ইতিপূর্বে আসা ভাই—বেরাদরেরা (প্রায় দু’কোটি) ভারতে থিতু হয়ে বসে নাগরিকত্ব, রেশনকার্ড এমনকী রাজনীতির আঙিনাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর রয়েছে সহোদরসম সেক্যুলার ডান-বাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—সাদরে বরণ করে নিতে।

বাংলাদেশ পৃথিবীতে জনসংখ্যায় সপ্তম আর আয়তনে ৯৩ তম। জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২০ লক্ষের বেশি। দেশের আয়তন, চৌদ্দ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আঠান্নববই বর্গ কিমি। ১৯০১ সালের ওই একই এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গ কিমিতে ২০৬ জন। বর্তমানে ২২৬৭ জন। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা (সূত্র ঃ www.bbssgov.bd)। এরপর উষ্ণায়ণ, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং ভূমিক্ষয়ে এলাকা প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু ধর্মান্ধ মুসলমানদের তো জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোনও কমতি হচ্ছে না। দেশের জনসংখ্যার ৭৮.৬ শতাংশই গ্রামে বসবাস করে। মূলত কৃষিজীবী। ‘আয়লা’ জমিকে লোনাজলে ভরিয়ে লবণাক্ত করে দিয়েছে। আগামী দু’তিন বছর ফসল ফলানোর সম্ভাবনা কম। দেশটির একদিকে বঙ্গোপসাগর আর প্রায় তিনদিকেই ভারতবর্ষ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা প্রায় ৪০৯৫ কি.মি.। বাংলাদেশের যেটুকু সীমানা মায়ানমারের সঙ্গে যুক্ত তার পরিমাণ ভগ্নাংশ মাত্র। আর মায়ানমারে মিলিটারি জুন্টার শাসনে বাংলাদেশীদের সেদেশে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উল্টোদিকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে মিলিটারির মার খেয়ে তাদেরকেই বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে হচ্ছে। তবে খালেদা জিয়া তাদের প্রায় ২২ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে বাংলাদেশে আলাদা করে রেখেছিলেন। অবশ্য যাবতীয় খরচ-খরচা রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। এখন যে বাংলাদেশ ভারতে তাদের জনগণকে গণহারে ঢোকাচ্ছে তারাই আবার রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ আটকাতে বেড়া দিচ্ছে। বাংলাদেশের ক’টি প্রধান শহর হল—ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং রংপুর। আশঙ্কাটা এরকম যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের জলস্তর একমিটার বৃদ্ধি পেলেই দেশটির পঞ্চাশ শতাংশ স্থলভাগ বিলুপ্ত হবে।

সেক্ষেত্রে বাড়তি এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা শুধু ওইসব শহরেই নয়, ভারতমুখী হবে ব্যাপকহারে। যে ভারতের অর্থনীতি ইতিমধ্যে অবৈধ বাংলাদেশীদের চাপে ভারাক্রান্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশী মুসলমানরা আর সীমান্ত লাগোয়া জেলাতে

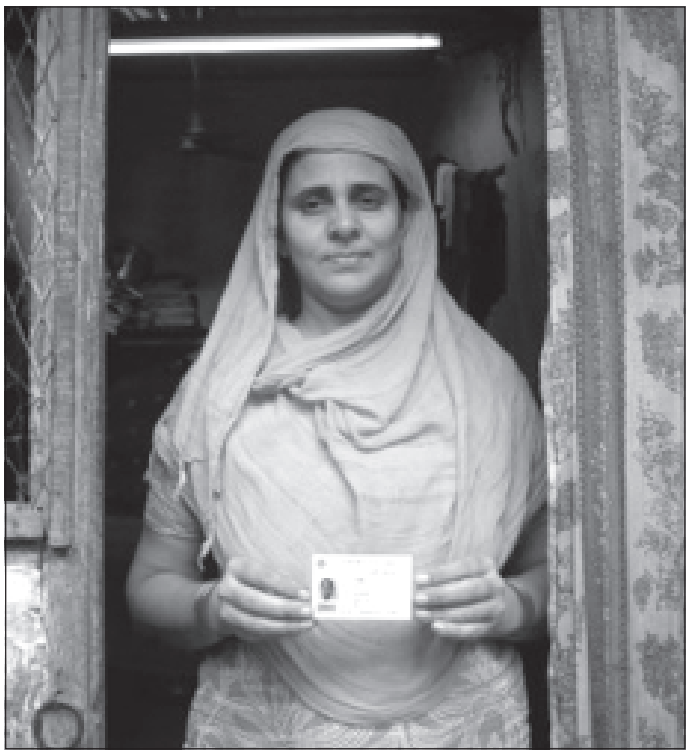

ভারতে ঢুকেই ভোটার।

সীমাবদ্ধ নেই। তাদের এখন জয়পুর, দিল্লী লক্ষ্ণৌতেও দেদার দেখতে পাওয়া যায়।

ঢাকা কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থার প্রমুখ পিটার কিম স্ট্রীটফিল্ডের কথায় ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় প্রতিবছরে জনসংখ্যা সাত শতাংশ হারে বাড়ছে, যা শহরের অন্যত্র মাত্র ১.১ শতাংশ।

ন্যাশন্যাল অ্যাকশন প্ল্যান মোতাবেক গ্রামীণ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে টান পড়ছে রুজি-রোজগারে, মার খাচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। সর্বাধিক ক্ষতির বা বিপদের সম্মুখীন উপকূলবর্তী এলাকা। নীচু এলাকায় বেনো জল আটকানোর ব্যবস্থা নেই। লবণাক্ত হচ্ছে কৃষিজমি। উৎপাদন কমছে। সাইক্লোন ও ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা বাড়ছে। এসব আগেও ছিল, কিন্তু কদাচিৎ হোত। এখন নিয়মিত হতে চলেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। ইতিমধ্যেই সীডার ও আয়লা পরপর আঘাত হেনেছে। ফলে উপকূলবাসী ও গ্রামীণ কৃষিজীবীরা শহরে পালিয়ে আসছে। সেখানেও ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। অতএব চলো ভারতে। শুধু কী কৃষিজীবী, মৎস্যজীবীরাও সঙ্কটে। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ বিভাগের ডেপুটি ডায়রেক্টর মহম্মদ জিয়াউল হকের কথায়—‘আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন যে গ্রাম থেকে শহরে মানুষ পালিয়ে আসছে। তবে, পরিসংখ্যান নেই।’ প্রশ্ন হ’ল, নেই না রাখা হচ্ছে না! সিনিয়র ফেলো সলিমুল হকের বক্তব্য—আগে যেরকম ভয়াবহ বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় ২০/২৫ বছরে একবার হোত এখন প্রতি পাঁচ বছরে তা হচ্ছে এবং হবে।

ফলে বাংলাদেশীরা আসছে, আসবে। এখন থেকে সাবধান না হলে ভুগতে হবে ভারতকে।

উলফা নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা

ধৃত উলফা নেতা চিত্রবন হাজারিকা ও শশধর চৌধুরীকে আদালতে তোলা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ধৃত উলফা নেতা শশধর চৌধুরী, চিত্রবন হাজারিকা, প্রদীপ গগৈ, প্রণতি ডেকা, মিথিঙ্গা দৈমারিদের শীঘ্রই টাডা আদালতে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুয়াহাটি থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে এখবর জানতে পারা গিয়েছে। এদেরকে কেস নং ৩২/১০-এর শুনানীর জন্য তোলা হবে। ইতিমধ্যে অসম পুলিশের পক্ষ থেকে গুয়াহাটি হাইকোর্টে এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানী একটু পিছিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ টাডা আদালতে শুনানীর সময়ে কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। কেননা সেখানে সংবাদ মাধ্যম যাবেই। উলফা নেতাদের পক্ষে অ্যাডভোকেট বিজন মহাজন জানিয়েছেন, অসম পুলিশের পক্ষ থেকে গুয়াহাটি হাইকোর্টে ক্যাম্পের মধ্যেই শুনানীর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। উলফা চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া, রাজু বরুয়া এবং রাজা বরাদের শুনানী গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ আদালত বসিয়েই শুনানী হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর দিন ঘোষণা না হলেও সূত্রমতে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি তা হওয়ার কথা।

ভারতজুড়ে ছোট রাজ্যের দাবী— কে কোথায় দাঁড়িয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই প্রতিবেদন লেখার সময় খবর হলো যে, কংগ্রেস তেলেঙ্গানা নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত বদল করেছে। ঠিক হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙ্গে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হবে। তেলেঙ্গানা-পন্থী চন্দ্রশেখর রাও-এর মাত্র এগারো দিনের অনশনে কংগ্রেসের চিত্ত বিগলিত হবে এবং তেলেঙ্গানা নামক আলাদা রাজ্যের প্রস্তাব মেনে নেবে—এমন যাঁরা ভাবছেন, তারা নেহাতই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ভৌগোলিক সীমানাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে স্থানীয় জনচরিত্রের নিরীখে ৬০টি জনপদ বা রাজ্যের অস্তিত্ব এবং প্রতিটি জনপদই হিন্দুস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আসমুদ্রহিমালচল এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে বাঁধা থাকবে এটাই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা দেশের মধ্যে বহু বা একাধিক রাজ্য তৈরি হলে তাতে অসুবিধের কিছু নেই। বরং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাতে সুবিধেই হবে। কিন্তু ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করতে শেখায়নি। মানুষের হীনমন্যতা এই জাতীয়তাবাদকে আধার করেই রচিত হয়। এই জাতীয়তাবাদই হিন্দুস্তানকে খণ্ডিত করে একদা ভারত, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ (অধুনা মায়ানমার), শ্রীলঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। সেই খণ্ডিত ভারতও শান্তি পায়নি। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়েছিল। সেই পাকিস্তানও পরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ধারণা নিয়ে এই খণ্ডগুলোকে আর মেলানো যাবে না। এদের মিলিয়ে দিতে পারে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ-ই। এখন একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ভারতবর্ষের ছোট ছোট যে অঞ্চলগুলি আলাদা রাজ্য গঠনের মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্রতা জাহির করতে চাইছে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি কীরকম।

তেলেঙ্গানা রাজ্য

দেশজুড়ে বিতর্কের ঘূর্ণাবর্তে অবস্থিত প্রস্তাবিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের জেলার সংখ্যা দশ। এর মধ্যে রয়েছে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদও।

এছাড়াও বাকি ন'টি জেলা হলো-রঙ্গারেড্ডি, মেডাক, নালগোণ্ডা, খাম্মাম, আদিলাবাদ, নিজামাবাদ, ওয়ারেঙ্গেল, করিমনগর ও মেহেবুবনগর। জেলাগুলির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষের মতো। ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন জুড়ে রয়েছে প্রস্তাবিত রাজ্যটি। অধুনা সাংসদ সংখ্যা ১৭। এই জেলাগুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বেশ পাকাপোক্ত। তথ্যপ্রযুক্তি নগরী হিসেবে হায়দরাবাদের খ্যাতি তো ভারত-জোড়া। হায়দরাবাদ ছাড়া বাকি ন'টা জেলা কয়লা আর চুনাপাথরে সমৃদ্ধ। সব মিলিয়ে ওই এলাকাগুলিতে ফার্মাসিউটিক্যাল, আই টি এবং তৎ-সংক্রান্ত শিল্পোদ্যোগ বর্তমানে যথেষ্ট আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে এলাকাটি বেশ পশ্চাৎপদ। বহু জমি সেখানে পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদি প্রশাসনিক উদ্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা সম্ভব হয় তবে ওই পতিত জমিগুলিকে শিল্পের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বুন্দেলখণ্ড

উত্তরপ্রদেশ ভেঙ্গে ও তার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের সাতটা জেলা জুড়ে দাবি উঠেছে বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের। বুন্দেলখণ্ড মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠা দুর্দ্ধর্ষ সব

ডাকাতের দল। চম্বলের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নির্জন দুপুরে মন কেমন করা অনুভূতি। গল্পের বইয়ের বুন্দেলখণ্ড বইয়ের বাইরে বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র। মোট চৌদ্দটা জেলা নিয়েই প্রস্তাবিত হয়েছে বুন্দেলখণ্ড রাজ্য। এর জনসংখ্যা ৫ কোটি। আয়তন ৬০ হাজার বর্গকিমি। সাংসদ রয়েছেন দশজন। এর মধ্যে ছ'জন মধ্যপ্রদেশের, চারজন উত্তরপ্রদেশের। প্রায় এক ডজন পর্যটন কেন্দ্র বাদ দিলে মধ্যপ্রদেশের পান্না হীরের খনিই এই এলাকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলে আসা দুর্ভিক্ষ এখানকার অর্থনীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করেছে।

হরিৎপ্রদেশ

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বুন্দেলখণ্ডের ঠিক বিপরীত চরিত্রের প্রস্তাবিত রাজ্য হরিৎপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশের ২২টি জেলা নিয়ে হরিৎপ্রদেশ গঠন করার একটা দাবী উঠেছে। প্রস্তাবিত ওই এলাকার জনসংখ্যা ৫ কোটি, আয়তন ৫০,০০০ বর্গকিমি। সংসদে আসন সংখ্যা ২২টি। প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম হরিৎপ্রদেশ শুনেই মালুম হয় শস্য-শ্যামলা একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে। ঠিকই ধরেছেন। একদা সবুজ বিপ্লবের নীরব সাক্ষী ছিল উক্ত অঞ্চলটি। নীরব এই কারণেই যে হরিৎপ্রদেশ হয়তো পাঞ্জাব কিংবা হরিয়ানার মতো নিজের মদগর্বী অহঙ্কারকে উচ্চকিত কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু উর্বরতার নিরীখে পাঞ্জাব-হরিয়ানার চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না এই এলাকাটি। বরং তাদের এই স্বভাব-বিনয় হরিৎপ্রদেশকে দিয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়।

পূর্বাঞ্চল

উত্তরপ্রদেশের ২৭টি জেলা নিয়ে প্রস্তাব এসেছে পূর্বাঞ্চল রাজ্য গঠন করার। এর আয়তন ৮৬ হাজার বর্গকিমি। প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বাস করেন এই প্রস্তাবিত অঞ্চলে। ২৩টি সংসদ আসন রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই এলাকাটি খুবই দুর্বল। অধিকাংশই চাষের জমি, কিন্তু উৎপাদন খুবই কম। এরপরে শিল্প না থাকার কারণে দারিদ্র্য এখানে একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

উত্তরপ্রদেশ

বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে জেলার সংখ্যা ৭১। প্রস্তাবিত বুন্দেলখণ্ড, হরিৎপ্রদেশ আর পূর্বাঞ্চল রাজ্য গঠিত হলে এর জেলার সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫। যে ১৫টি জেলাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই নতুন উত্তরপ্রদেশ রাজ্য গঠনের দাবী উঠেছে। প্রস্তাবিত নতুন এই এলাকার জনসংখ্যা তিন কোটি। আয়তন ৭০ হাজার ৯২৮ বর্গকিমি। সাংসদ সংখ্যা ৩১। প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে শহুরে এবং গ্রাম্য—এই দু'টি এলাকাভিত্তিক ভাগ করলে শহরে এলাকার অর্থনীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে কানপুর শিল্পতালুক এবং গ্রাম্য এলাকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হবে প্রভূত আম চাষের মাধ্যমে। কানপুর আই আই টি-র মতো উৎকৃষ্টমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অহমিকাও বাড়তি পাওনা হবে রাজ্যটির।

বিদর্ভ

মহারাষ্ট্রের ১১টি জেলা নিয়ে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিদর্ভ রাজ্যের। প্রস্তাবিত রাজ্যের আয়তন ৯৭, ৩২১ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ২ কোটি ৬৩ লক্ষ। সংসদে

আসন সংখ্যা ১০। ওই জেলাগুলোতে প্রভূত পরিমাণে তুলো চাষ হয়। যদিও শিল্প (industry) এখানে গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। এমনকী তুলো উৎপাদনকে কাজে লাগিয়ে যে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরি হবে সে লক্ষণও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

কোডাগু

এটি একটি স্বল্পপরিচিত অঞ্চল। কিন্তু কর্নাটকের একটি মাত্র জেলাকে ঘিরে সেখানকার মানুষ পৃথক রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন। বায়োলজিক্যাল হটস্পট, জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার

পাদদেশে অবস্থিত কর্ণাটকের প্রত্যন্ত এই জেলাটিতে মানুষ বাস করেন মাত্র ৬ লক্ষ। আয়তন আরও কম, প্রায় ১৪০০ বর্গ কি.মি. মাইসোর লোকসভা কেন্দ্রের অর্ন্তগত এই জেলাটির অধিবাসীদের মূল জীবিকা কফি চাষ।

সৌরাষ্ট্র

গুজরাতের সাতটি জেলা নিয়ে সৌরাষ্ট্রবাসীর স্বপ্ন নতুন সৌরাষ্ট্র রাজ্য। প্রস্তাবিত রাজ্যের জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ আয়তন প্রায় ৮০,০০০ বর্গ কিমি। সাতজন সাংসদ রয়েছেন। এখানকার

অধিবাসীদের মূল জীবিকা কৃষি। রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছগুড্ডতুগ্ন-এর ৫২ শতাংশ-ই সৌরাষ্ট্রের। এছাড়া মাছচাষ এবং অপরিশোধিত তেলের শোধন এখানকার শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রচনা করে দিতে সাহায্য করেছে।

গোর্খাল্যান্ড

বহুশ্রুত গোর্খাল্যান্ড নামক পৃথক রাজ্য পাহাড়বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। পাহাড় বলতে দার্জিলিং। পশ্চিমবঙ্গবাসীর গ্রীষ্মের সেরা গন্তব্য। কিন্তু বাম সরকারের দীর্ঘদিনের অবহেলায় আর প্রতারণায় (দার্জিলিং-কে ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করা যার চরমতম প্রমাণ) গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলন গত লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই দানা বেঁধেছিল। দার্জিলিং, ডুয়ার্স, আর তরাই অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখছেন গোর্খারা। তাদের প্রস্তাবিত 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের আয়তন ৬,৪৫০ বর্গ কিমি। মানুষ বাস করেন প্রায় ৩০ লক্ষ। সাংসদ বলা বাহুল্য একজনই। এখানকার অর্থনীতিটার পুরো বারোটা বাজিয়েছে সিপিএম। এখানকার অধিবাসীদের মূল জীবিকা ছিল চা-চাষ। কিন্তু সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর কৃপায় চা বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আপাতত স্রেফ পর্যটন শিল্পের ওপরেই ভরসা করছেন পাহাড়বাসী। তবে দুগ্ধ-প্রকল্প ও ফুলচাষও এখানকার অন্যতম জীবিকা।

বোড়োল্যান্ড

অসমের চারটে জেলাকে নিয়ে বোড়োল্যান্ড নামে একটি ছোট রাজ্যের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত রাজ্যের জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ। সাংসদ মাত্র ১ জন। এলাকার আয়তন ৮,৭৯৫ বর্গ কিমি। এখানকার অধিকাংশ মানুষেরই জীবিকা কৃষিকাজ পশুপালন। কৃষিকাজ বলতে মূলত ধান জাতীয় চাষই করা হয় বেশিরভাগ। এই নতুন রাজ্য গড়ে উঠলে মানস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিঃসন্দেহে এর সৌন্দর্য্য বর্ধন করবে।

মহাকোশল

উড়িষ্যার দশটি অঞ্চল নিয়ে 'মহাকোশল' রাজ্য তৈরির দাবী তোলা হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই এলাকাটিকে পশ্চাদ্‌পট বললেও খুবই কম বলা হয়। শিশু বিক্রির বদনাম মহাকোশলের ওপর কালো ছায়া ফেলে রেখেছে। দুর্ভিক্ষ আর খরা পীড়িত এলাকাবাসী নতুন আলোর পরশ পেয়েছেন স্টীল প্ল্যান্ট, সিমেন্ট কারখানা এবং কয়লাখনি গড়ে তোলার মধ্যে। নতুন রাজ্য তৈরি হলে তা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে—এটা বলাই বাহুল্য। যাই হোক প্রস্তাবিত এলাকায় সাংসদ সংখ্যা ৬, জেলা ১০, আয়তন ৫০, ৩৯৯ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ।

ভোজপুর

প্রস্তাবিত ভোজপুর রাজ্য দেশের মধ্য-বলয়ের তিনটে রাজ্যের ২৩টি জেলাকে নিয়ে গড়ে ওঠার কথা। ভোজপুরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ১২টি, বিহারের ৯টি এবং মধ্যপ্রদেশের ২টি জেলা রয়েছে। প্রস্তাবিত এলাকার আয়তন ৮৬ হাজার ৩৪৬ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। রয়েছে ১১টি সংসদীয় আসনও। এখানকার মানুষরা মূলত কৃষিনির্ভর। তবে শিল্পের মধ্যে ইদানীং প্রচুর সুগার মিল গজিয়ে উঠছে প্রস্তাবিত রাজ্যে।

মিথিলাঞ্চল

ভোজপুরের পাশাপাশিই বিহারের ১০টি জেলা নিয়ে প্রস্তাব রয়েছে মিথিলাঞ্চল গড়ে তোলার। এই এলাকার সাংসদ পদ ১১টি। তবে ভোজপুরের তুলনায় জনসংখ্যা এখানে বেশ কম। চার কোটির মতো। আয়তন ২০ হাজার ৫৭২ বর্গ কিলোমিটার। এখানকার মানুষেরও মূল জীবিকা কৃষি। তবে খাদ্য সংকটও এ-অঞ্চলে ১২ মাসই দেখা যায় এবং সেই কারণে ভারতের দরিদ্রতম এলাকাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

গন্ডোয়ানা

খনিজ সম্পদ নিয়ে ভূগোলের পাঠ্য বই-এ (তা যে কোনও শ্রেণীরই হোক না কেন) কোন চ্যাপ্টার থাকলে সর্বাগ্রে বোধহয় থাকে গন্ডোয়ানার নাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই গন্ডোয়ানা, মধ্যপ্রদেশ থেকে আলাদা রাজ্যের প্রস্তাবে প্রস্তাবিত রাজ্য! মধ্যপ্রদেশের মোট ২৬টি জেলাকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে এই রাজ্যটি। এর আয়তনও বিশাল বড়, ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বর্গ কিমি। সাংসদ সংখ্যা ১৫, মনুষ্য সংখ্যা ২ কোটি ৬৫ লক্ষ।

বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত রাজ্যটির হাতিয়ার এর অসাধারণ খনিজ সম্পদ। লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ এবং কয়লা-র সম্পদে সমৃদ্ধ এখানকার মানুষজনের কাজের অন্তত কোনও অভাব নেই। উপরন্তু পান্না-র বিখ্যাত হীরাখনির একাংশও এই এলাকার মধ্যে পড়ছে। সেইসঙ্গে প্রচুর বনজসম্পদের অধিকারী এই গন্ডোয়ানা রাজ্য। যেগুলো এলাবাসীর সামনে কাজের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

কবিতা

মহাভারত

প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ বলে বা কেউ,
ইতিহাস কতখানি পণ্ডিতেরা সন্দিহান—
সমাজতত্ত্বের বীজ অন্বেষণ করে গবেষক,—
কূট রাজনীতি, ছলনা কাপট্য, ক্রূরতা,
ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা, ভজুয়া খেলা,
বহুকামী পুরুষের লীলা, নারীর বাসনাবহ্নি
ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম—সবই আছে এই
ছন্দে লেখা মহাউপন্যাসে।
কিন্তু কৃষ্ণ পটের উপরে—
ব্রহ্মচারী পুরুষের দীপ্ত আত্মত্যাগ
পুণ্যবতী সতীর কাহিনী,—
রাজপুত্রের ক্ষুদান্ন গ্রহণ,
বীর্যবন্ত পুরুষের সর্বস্বদানের—
অনুপম কথা—ধর্ম যথা জয় তথা,
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা।
লোভ আর লালসার মৃত্যু যে পুরস্কার
প্রমাণিত বার বার তবু শোনা যায়
জয়ের গভীরে
মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস
বিয়োগান্ত মহানাটকের ।।

স্মৃতিকথা

এক অনামী মানুষের স্মৃতিকথা

অনামী

কত বছর ধরে মনে মনে কত কথাই আলোচনা করেছি। ভেবেছি লিখতে হবেই— কারণ লেখাটাই থাকবে, আর কিছু থাকার কথা নয়। তাও হঠাৎ কারুর নজর এই খাতাটায় পড়লে তবে। নাহলে বিস্মৃতির অতল তলে। কথাগুলো ভুল নয় যে এতো দীর্ঘ জীবনের দেখে শেখা বা ঠেকে শেখার বিষয়।

'I remember' poem নাতি পড়ছে স্কুলের পড়া। আর আমার স্মৃতিতে উদয় হচ্ছে ১৯৩৫-এ পঞ্চ ম জর্জের রজতজয়ন্তী কেমন ভাবে স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা পালিত হয়েছিল। ষষ্ঠ ক্লাসের ছাত্র আমরা, তাই আমাদের প্রচেষ্টা দশম ক্লাসের অনুকরণ করা। সম্ভব না হলেও তখনকার দিনে অতি জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। স্কুল অনুদান পেয়েছিল নিশ্চয়ই।

দেশে সবে গান্ধীবাবার স্বদেশী আন্দোলন শুরু। আর পাঁচজনের দেখাদেখি আমাদের পাড়া ও বাড়ির ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে চড়কা চালিয়েছি। তোকুলিতে পথেঘাটে চলতে সুতো কেটেছি। হাতেকাটা সুতোয় কাপড় বুনিয়ে পরেছি ও গায়ে দিয়েছি সেই কাপড়ের জামা। একটা অন্য অনুভূতি। যেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আমরাও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৩.৯.৩৯ শুরু হলেও ভারতের উপর প্রভাব ১৯৪০ থেকেই। কলকাতায় বোমা পড়ার আতঙ্কে ও ভয়ে অবাঙালী তো শহর ছেড়ে নিজেদের দেশে চলে যেতে লাগল। যেইনা রাতে হাতিবাগান বাজারে ও সংলগ্ন সিকদার বাগানে বাড়ির ছাদে জাপানি বোমা পড়ল সঙ্গে শহর ছেড়ে পালাই-পালাই-রব। একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল ঘিঞ্জি কলকাতা শহর। গুজব জাপানি মেয়ে পাইলটরা বোম রিলিজ করেছিল। সত্যিমিথ্যা বোঝা সম্ভব ছিল না। কারণ সংবাদ প্রচারিত হত ট্রচত্ম থেকে যেটা লোকে মোটেই বিশ্বাস করতো না। আর সংবাদপত্রের ওপর ছিল সেন্সারের প্রথা। অজাদ হিন্দ্ প্রচারিত খবর যাতে রেডিওতে না শোনা যায় তারজন্যে ঘড়ঘড় আওয়াজের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

ভালভাবে কিছু বুঝতে না বুঝতে এসে গেল দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। 'মা একটু ফ্যান দাও', ক্ষুধার্থের ভিক্ষা করার আকুল আবেদন আজও ভুলতে পারিনি।

এমনকী আমরাও কোনভাবে খেতে বাধ্য হয়েছি। চালের আকাল। অভাব, অনটনসহ নানা অসুবিধায় মানুষ মুমূর্ষ। আমেরিকা ফেললো হিরোসিমায় ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা, ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করল, তার সঙ্গে INA বন্ধ করল Aug, ১৯৪৫, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের জন্য হতাহতের কথা অবর্ণনীয়। এখন লোকে এর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে। জানতে পেরেছে ঢত্বট্ট-এর প্রভাব ও অবদান। কিন্তু তখন সবাই ছিল অন্ধকারে। ওদিকে ঘটে গেল পাকিস্তানের দাবিতে কলকাতায় দাঙ্গা / রায়ট ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ তৎকালীন লীগ সমর্থিত বাংলা সরকারের দ্বারা।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের ও পাঞ্জাবের। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চি ম পাঞ্জাবের বাসিন্দা

সাহিত্যের পাতা

হিন্দু ও শিখরা অপ্রত্যাশিত ভাবে জড়িয়ে পড়লো দাঙ্গায়। প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এলো ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে। বিশেষ করে কলকাতায় এবং দিল্লিতে। সহায় সম্বলহীন দুঃস্থ—নাম হল রিফিউজি।

বয়স বাড়ার সাথে ধীরে ধীরে মানুষের যে পরিবর্তন হয় সেটা বেশ অনুভব করতে পারছি। একই বয়েসের একই রকম চিন্তা আবার অন্য বয়সের অন্যরকম আপনা থেকেই হয়ে যায় (obsolite) বাতিল। যেমন গ্রামোফোন, রেডিও এবং ট্রান্সমিটার এমনকী সাদাকালো টিভিও প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। এই টেলিফোনের ব্যাপারটা ধরুন— একসময় পাড়ায়ই কতজনেরইবা ফোন ছিল? আর আজ ফোনের ছড়াছড়ি সারাদেশে। বলে না বয়সের অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ নানা রকম দেখেও শুনে লোকের জ্ঞান বাড়ে, বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, বাড়ে অভিজ্ঞতা। যে বয়সে যেমন করা উচিত সেইরকম করা যথাযথ। পরে করবো ভেবে ফেলে রাখা উচিত নয়। বাসনাদি যেমন অবসরের পর (Retirement) রেখে দিলে হয়ে ওঠে না। একসময় শরীর স্বাস্থ্য অনুকূল হয় না বিদেশ ভ্রমণে। বহুকালের বাসনা থাকলেও পূরণ হয় না। অবশ্য সুযোগ সুবিধা ব্যাপারটা না বুঝি তা নয়।

মন এমনি একটি বস্তু যেটা মানব শরীরে কোথায় আছে না জানলেও বেশী বয়সে মনে না থাকা, ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা থাকেই কমবেশি সকলের। মনের আনন্দ ও দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকা। মনের গতি অতি দ্রুত সীমাহীন। স্মৃতিশক্তিটাও মনকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, আচমকা সামান্য অসুস্থতায় ২২.১২.০৬ সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী ডাক্তার, কন্যা ও জামাতা এবং আমার সামনে বিছানায় হার্ট ফেল করলো। এতোই অস্বাভাবিক ঘটনা যে ব্যাপারটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। কান্না ভুলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আর লিখতে পারবো না। কিন্তু জীবনের শেষ অধ্যায় লিখতে বসেছি। কেন জানিনা বেশ কিছুদিন থেকে চিন্তা করতাম সাথীহারা মানুষেরা কেমন ভাবে বেঁচে থাকে? অথচ আমাকেও থাকতে হচ্ছে এখন, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

ভবিতব্য কাকে বলে সেটা এখন ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি অর্থাৎ যা ঘটবার তা ঘটবেই।

আশীর্বাদ করে "শতায়ু হও" অর্থাৎ দীর্ঘজীবন কামনা। কিন্তু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাটা অনেক সময় অভিশাপে পরিণত হয়, কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোকতাপ ঘটে যায় অনেক সময়। এছাড়া থাকে বার্দ্ধক্যজনিত দৈহিক অক্ষমতা আর তার সাথে আছে অসুস্থতা। শেষের দিন গোণা ছাড়া করার কিছু নেই। শুনেছি বিদেশে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের আইন আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নেই। থাকলে মন্দ হত না। আইন বিভাগের অভিমত ওটা অপব্যবহার করার সুযোগ হয়ে যাবে। প্রথমত মৃতের সম্পত্তি পাবার আশায় এই আইনের অপপ্রয়োগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া বাকি ঝামেলা এড়াতে এবং নিত্যরুগীর সেবা ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করা ইত্যাদির নিষ্পত্তিকল্পে এই আইনের অপব্যবহার হতে পারে। আমার মতে তথাপি বয়স্কলোকের ইচ্ছামৃত্যুর আইন থাকা ভাল। মরণোত্তর চক্ষুদান-দেহদান যেমন আইনসিদ্ধ। নিজের ক্ষেত্রে ওইগুলি করেছি এখন।

জানার কথা নয়, কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় চলে যাব, কোনও একদিন। অতি সাধারণ মানুষ এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা। সফলতা ও বিফলতা নিয়েই কর্মজীবন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্থান ও পতনের জীবন। যেমন সচরাচর দেখা যায়।

সেদিন দূর নয় যখন চিরতরে নীরব, নিস্তব্ধ হতে হবে। তারপর সব শেষ। যেমন বিগতদিনে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, এটাই রীতি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর আলোচনার বিষয় হবে। কেউ বলবে ভাল, কেউ বলবে মন্দ, সুনাম ও দুর্নাম করাটা আস্তে ধীরে কমে যাবে, শেষে চুপচাপ। সাথে আসবে ভুলে যাওয়ার পালা। যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম। এটাই নিয়ম। মানুষ আসে-যায় শুধু চিহ্ন রেখে যায় সুকর্মের। মনীষীদের জীবনী পড়ে এই ধরনের অনুভূতি হয়েছে। ভবিতব্য অর্থাৎ যা ঘটবার তাই ঘটবে এবং আমায় মেনে নিতে হবে, যেমন এতোদিন মানতে হয়েছে। আমিও তো অবস্থার দাস! সবেরই শেষ আছে। মনে মনে বলি—হে ঈশ্বর পরম করুণাময় ভগবান!

গল্প

যন্ত্রমানব

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

বিভু এখনও বেরোসনি! নটা বেজে গেল। যা শিগগিরি বাজারটা করে নিয়ে আয়।

হাঁক দিলেন গায়ত্রীদেবী। বিভু গাঁয়ের ছেলে। মেদিনীপুর তার বাড়ি। বয়স ২৫/২৬ হবে। গ্রামের বাড়িতে তার বাবা এবং মা থাকেন। তাদের বেশ কিছু নিজস্ব জমি-জায়গা আছে। বাবা সেই জমিতে চাষ-আবাদ করেন। সংসারটা মোটামুটি খেয়ে পরে চলে যায়। বংশের নিয়ম অনুযায়ী বিভুরও জমিতে লাঙল দেবারই কথা ছিল। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ বিভুর হাতে লাঙল ধরতে সম্মানে বাঁধলো। তার অনেক উচ্চাশা—সে শহরে যাবে, চাকরি করবে। এই গ্রামে পড়ে থেকে কি হবে?

বাড়িতেপ্রায়ই অশান্তি হোতপ্রথম প্রথম। বাবা বলতেন, আমার বয়স হচ্ছে। এবার জমি-জায়গা দেখ। মাঠের কাজ শেখ।

কিন্তু বিভুর সেদিকে মন নেই। সিনেমার পর্দায় দেখা কলকাতা শহরটা তাকে টানে।

সে বাবাকে বলে, আমি চাষ করব না বাবা। আমি কলকাতায় যাব, চাকরি করবো। ও পাড়ার নিপেনও তো শহরে কাজ করছে।

কিন্তু ভালো চাকরি পাওয়া কি সহজ কথা? — ও গেলে পরে একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবে। অতো বড় শহর আর একটা কিছু জুটবে না!

বাবা অনেক চেষ্টা করেও যখন বিভুর মতি ফেরাতে পারলেন না, তখন নৃপেনের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

সেই নৃপেনের চেষ্টাতেই ভবানীপুরের সান্যাল বাড়িতে কাজ জুটলো বিভুর। প্রথমবার হাওড়া স্টেশন থেকে বেড়িয়ে শহর দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বিভু। এমনটাই তো সে চাইছিল। তারপর সান্যাল বাড়ির চাকচিক্যে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিভু। তাকে নিয়ে বাড়িতে ছ'জন কাজের লোক। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে মুগ্ধতায় ঘুণ ধরতে লাগল।

এ কেমন জীবন এখানে? মিঃ সান্যাল রোজই রাত করে বাড়ি ফেরেন। আর যখন ফেরেন, তখন আর তাঁর হাঁটার মতো অবস্থাও থাকে না। ড্রাইভারই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। গিন্নিমাও অর্ধেক দিন লেট নাইট পার্টিতে যান। আর একমাত্র মেয়ে টুকটুকি। তার কথা আর কি বলবো! অত্যন্ত জেদী ও গোঁয়ার মেয়ে। প্রথমবার তাকে দেখে বিভু চোখ বুজে ফেলেছিল, এমনই পোশাক!

একদিন মনে আছে টুকটুকি বন্ধুদের নিয়ে তার বাড়িতে পার্টি দিয়েছিল। সেখানে গানের সঙ্গে তাদের নাচের ভঙ্গিমা দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। যখন বোতল খোলা হল, ছেলেদের সাথে মেয়েদেরও মদ্যপান করতে দেখে তার চক্ষুস্থির। বাড়ির মেয়েদের সে এতদিন শাড়ি, ঘোমটা ব্যবহার করতেই দেখে এসেছে। এখানে যেন অন্য এক জগৎ। তবে এই জগৎটার সঙ্গে বিভুর মানসিকতা যেন মিলছিল না।

বাজার করে ফিরেই বাড়িতে ঢুকে বিভু বুঝলো কিছু একটা ঘটেছে। সারা বাড়িটা থমথম করছে। অন্য একজন চাকরের কাছেই বিভু শুনলো দাদুমণি মারা গেছেন। দাদুমণি মানে মিঃ সান্যালের বৃদ্ধ বাবা।

আশির উপর বয়স হয়েছিল। সারাদিন বিছানাতেই কাটাতেন। আচমকা কিছুক্ষণ আগে চোখ বুজলেন।

মিঃ সান্যাল অনবরত মোবাইল ফোনটা নিয়ে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। বোধহয় আত্মীয়দের জানাচ্ছেন। টুকটুকি আর মিসেস সান্যাল ড্রইংরুমের সোফায় থম মেরে বসেছিলেন। সান্যালবাবু বলে উঠলেন — আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আজকে জরুরি মিটিং ছিল। ফরেনের পার্টি আসছে। অনেক টাকার কন্ট্র্যাক্ট ছিল। বাবা এমন বেহিসেবির মতো মরল—

গায়ত্রীদেবী বললেন, কি আর করা যাবে। তুমি মিটিং এ চলে যাও। বরং মিটিংটা সেরে শ্মশানে চলে যেও সোজা। ততক্ষণ আমি এই দিকটা সামলাচ্ছি।

তাই ভালো, আমি বরং বেরিয়েই পড়ি। সোফা থেকে উঠে পড়লেন সান্যালবাবু। সান্যাল দম্পতি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বিভু এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল। টুকটুকি কাকে ফোন করে বললো—আজকে আমি সিনেমা দেখতে যেতে পারব না। ও প্রান্ত থেকে বলা কিছুর উত্তরে সে বললো, আর বলিস না, বুড়োটা একটু আগে টেঁসেছে। এখন কর্তব্য তো করতে হবে। না হলে লোকে কি বলবে বল? ব্যাড লাক ইয়ার। কাল পার্টিতে দেখা হবে। বিভু কেমন বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্রামের বাড়িতে বিভু যখন ঢুকলো তখন সন্ধ্যা ছটা। বাবা সবে মাঠ থেকে ফিরেছেন। বিভুকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, কিরে বিভু, কিছু না জানিয়ে হঠাৎ চলে এলি? একমাসে তো একটা চিঠিরও উত্তর দিসনি?

মা পাশ থেকে বলে উঠলো, শহরে গিয়ে বিভু আমাদের ভুলে গেছে। বিভু ধীরে ধীরে দাওয়ায় বাবার পাশে বসে বললো, হ্যাঁ বাবা, শহরের আসল রূপটা চোখে পড়ল। ওখানকার বড় বড় লোকেরা আমাদের ঘৃণা করে ছোটলোক বলে। কিন্তু বাবা, এই ছোট লোকগুলোর মধ্যে এখনও মনুষ্যত্ব আছে। ওখানকার বড় বড় মানুষেরা একটা বড় বড় যন্ত্র। বাবা স্মিত হেসে বিভুর মাথায় হাত রাখলেন।

ভ্রমণকথা

স্মৃতির মণিকোঠায় 'সাকুরা'

রুনা চৌধুরী (রায়)

"সাকুরা সাকুরা
ওয়াইও ইনো সোরাওয়া
মিওয়াকাসু খগিরি
কাসুমিকা সুমোকা-নিওই শে ইয়ুরা
ইজাইয়া ইজায়া
মিনিয়ুকনে"॥

চতুর্দিকে এখনও শীতের কিঞ্চিৎ আমেজের ছোঁয়ায় রোমান্সের স্পর্শ। উপরে মেঘমুক্ত আকাশে পেঁজা তুলোর জমাট রাশির ফ্রেম, আর তারই মাঝে ভরা উচ্ছল যৌবনের ডালি সাজিয়ে সাকুরার দল আহ্বান জানাতে ব্যস্ত বসন্তের রঙ্গিন নূতন দিনগুলিকে। সারা বছরের মধ্যে এই মাসের জন্য সবার কতই না আকুলি বিকুলি। নিঃসাড়ে সারা বছর শুধু দিন গোনা। সমস্ত জাপানে তথা টোকিও জুড়ে এসেছে সেই বহু অভিলষিত সাকুরার দিনগুলি। জাপানের দক্ষিণ থেকে উত্তর অর্থাৎ কিয়সু থেকে হোক্কাইডো পর্যন্ত স্থান জুড়ে সাকুরা তার স্থান অধিকার করে রেখেছে। সারা বছর গাছগুলিতে কোনও পাতা থাকে না। শীত বিদায় নেবার পর থেকেই ফুল, কুঁড়ি, উঁকি মেরে গাছের ডালপালার আনাচে-কানাচে আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় উন্মুখ থাকে। সেইসঙ্গে মানুষের মনেও একটা ভ্রমর গুঞ্জনের সুর বইতে থাকে। গাছগুলিকে দেখলে মনে হয় ওরা যেন বড় নিঃসঙ্গ, হাওয়ার দমকায় বৃন্তচ্যুত হতে দেরি লাগে না, তাইতো ছুটির সকালে দলে দলে টোকিওর সমব্যথী মানুষেরা ওদের স্নেহ জানাতে যায়। থোকবাঁধা জমাট মেঘের কালো বোরখার উন্মোচন হতেই ঝলমলে সোনালী রোদ কাঞ্চ নবর্ণ ধারণ করে সাদা আর আবছা বেগুনী রঙের ঘের দেওয়া সাকুরার দল। পত্রহীন গাছে শুধু ফুলেরই হাট। সাকুরার ইংরেজী নাম-চেরিব্লসম। জাপানীরা কিন্তু সাকুরা নামটাই বেশী পছন্দ করে, আদর করে ওই নামেই ওদের ডাকে।

প্রথম সাকুরাদর্শন আজও আমার মন ছুটিয়ে নিমেষে নিয়ে যায় টোকিওর সিন্টোগড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে, যেখানে প্রেম আর ভক্তির মূর্ত প্রতীক স্বরূপ সাকুরা তার ভরা যৌবনের ডালি সাজিয়ে জনগণের আহ্বানে রত। জাপানীরা সম্ভাষণ জানায় বিগলিত কণ্ঠে—এবার আমাদের সাকুরা দেখবে না? সাকুরা? অবাক বিস্ময়ের যবনিকাপাত ঘটিয়ে তারা উত্তর দেয়, সাকুরা ওয়াতাসিনো হানা দিসনে—অর্থাৎ আমাদের শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয় ফুল।

জীবন জুড়ানো বিস্ময়ে সেদিন সাকুরার সমাহার দেখেছিলাম।

এমনিতেই জাপানীরা ফুল, গাছপালা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। শীতের শেষে তারা প্রত্যেক গাছে খড় এবং কীটনাশক ওষধ দিয়ে ঢেকে রাখে, টাইফুন বা বাতাসে যাতে না পড়ে যায় তার জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে। দিনের শেষে হোসপাইপ দিয়ে গাছকে স্নান করায়। এদের ফুল সাজাবার নিত্য নতুন কায়দা বিশ্ববন্দিত এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ফুল সাজানোর শিক্ষালাভের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এককথায়, জাপানীদের জীবনে সাকুরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাকুরা সরকারিভাবে জাতীয় ফুল না হলেও এর আবির্ভাবের জাঁকজমক এখন অন্যান্য ফুলদের হার মানিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। জাপানীদের অধিকাংশই একে জাতীয়

ফুলের আখ্যায় অভিষিক্ত করেছে। পত্রহীন গাছে ভরা শুধু সাকুরার গোলাপী, সাদা হালকা বেগুনী কত রঙেরই বিচিত্র সৌন্দর্য মানুষকে দূর থেকে আকর্ষিত করে তার পাদপৃষ্ঠে এনে দাঁড় করায়। তবে সাদা আর আবছা বেগুনীর সমারোহই বেশী। হালকা হলুদের বিস্তৃত গুচ্ছও কম চিত্তাকর্ষক নয়। কুঁড়ি ধরে, মৌচাক বসে ভ্রম ভেঙে যায় প্রস্ফুটিত যৌবনের প্রজাপতির মেলা দেখে। বহুদূর থেকে এই ফুলগুলোর জ্যোতিও স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, মনকে কেড়ে নেয়, সমস্ত ফুল সমবেত রূপে একে অন্যের গলা জড়িয়ে উল্লাসের সৃষ্টি করে, হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। একক চিন্তাধারার বশবর্তী মানুষেরা সেদিন তাদের 'দোদুলমান' অর্থাৎ ছোটছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে, কেউ বা ওবাসানের ঠাকুমার পিঠে চড়ে, ভাইবোন হাত ধরাধরি করে, মা-বাবা সমেত, প্রেমিক-প্রেমিকা সব ছড়িয়ে রয়েছে সার দেওয়া সাকুরার আচ্ছাদনে এখানে ওখানে—কেউ আর একা নেই। থোক বাঁধা সাকুরার সঙ্গে মানুষও থোক বেঁধে ঘিরে ঘিরে গুঞ্জনে রত। ক্ষণিক আগমনের জন্যই হয়তো মানুষের সাকুরাকে সযত্নে ধরে রাখার এতো প্রচেষ্টা। ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হয় আবার পনেরো দিনের মধ্যে বিলুপ্ত হতে থাকে, ঝড়ে পড়ার শেষ বিদায় ঘণ্টা জানাতেই মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হতে শুরু করে। জাপানের অধিবাসীরা সাকুরাকে অনেক জায়গায় প্রতীক চিহ্ন রূপে ব্যবহার করেছে। একে কেন্দ্র করে অনেক গান, কাব্যগ্রন্থ, রচনা, কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। জাপানের ইতিহাসে সাকুরার বিশেষ স্থান— অত্যন্ত জনপ্রিয় রূপে সমাদৃত। ফুলে, ফলে ভরপুর সুখ সৌন্দর্যের ডালির রূপক এই জাপান তার বিশেষ ফুলকেও প্রিয় আপনজন করে নিয়েছে।

টোকিওর শিনজিকু বাগানে গেলেই দেখা যাবে সারি সারি দণ্ডায়মান ঘন সন্নিবেষ্টিত সাকুরার দল। দূর থেকে দেখলে সত্যি মনে হবে আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত মেঘের দল নেমে এসে ধরার বুকে নজরবন্দী হয়ে আছে। তারই কোল ঘেঁসে কত নারী-পুরুষ আনন্দের পসরা সাজিয়েছে।

পরিখা ঘেরা এম্পায়ার হোটেলই হোক, কিয়োটোর রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যময় বিস্তৃত বাগানই হোক, মোটকথা সমগ্র জাপানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে সাকুরার সারি চলার পথে আপনাকে একবার থমকে দেবেই। সাকুরার গান জাপানের প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। আধফোটা ছেলেমেয়েরাও জন্মের পরই অস্ফুট আধো আধো স্বরে গেয়ে চলেছে এই গান। জাপানের বিখ্যাত N.H.K. আকাশবাণী থেকে এই গান গেয়ে শোনানো হয়। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সাদা পোশাক পরে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে এই গান গেয়ে শোনায়।

আজ এখন এই সাকুরার স্মৃতি উন্মোচনের সময়ে সাকুরা বিদায় নিয়েছে, সব গাছ ভরে শুধু কচি পাতার ভীড়, কিন্তু সাকুরার সাড়া কি মন থেকে মোছা যায়? সাকুরা তো আবার সবাইকে সময়মতো আহ্বান জানিয়ে একত্রিত করে নেবে।

সবমিলিয়ে জাপানের মতো সুন্দর জায়গা বুঝি ত্রিভুবনে নেই। ওখানকার থাকার হোটেল, রাস্তাঘাট, হাইওয়ে, বাগ-বাগিচা, স্বর্ণবর্ণ খচিত আলোর ন্যায় সজ্জিত সুদীর্ঘ টানেলগুলি। সমুদ্রের নীচ দিয়ে ম্যাজিকের যাদুদণ্ডে টানেলের ভিতর দিয়ে হুশ করে সমতলভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়ানো, বিশাল জায়গায় ডিপার্টমেন্টের অবর্ণনীয় আধুনিক আকর্ষণে সাজসজ্জা, এসকালেটারের পরিক্রমা, সর্বসুখস্পর্শী- মুক্ত আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করা, সর্বোপরি জাপানীদের হসপিটালিটি অর্থাৎ সাদর আতিথেয়তা যা বিশ্ববিখ্যাত সবমিলিয়ে ঝলমলে জাপানী রূপকথার কাহিনি

(এরপর ১১ পাতায়)

পরিবেশ ও প্রকৃতি পূজা

আজ মানব সভ্যতা চরম বিপদের সম্মুখীন। আজ যদি পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী আমরা মানুষরাই। আমাদের লোভ-লালসা ও ভোগবাদী মানসিকতা-প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানবসভ্যতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছি।

কারখানা, যানবাহন, বিভিন্ন মেসিন থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, সেই বিষাক্ত গ্যাসগুলি মহাকাশে আমাদের রক্ষাকারী "ওজোন স্তর"-কে ফুটো করে দিচ্ছে। এর ফলে সূর্য থেকে নির্গত, আমাদের ধ্বংসকারী অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে সরাসরি চলে আসছে। এর সাথে আমাদের রক্ষাকারী গাছপালা নির্বিচারে কাটছি ও অরণ্য ধ্বংস করছি। এই সব কিছুর পিছনে আছে, আমাদের ভোগবাদী মানসিকতা—যা আমরা ধ্বংসকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে চলেছি। এর ফলে মানবসমাজ নিজেরা ধ্বংস হবে এবং সেই সঙ্গে বাকি সমাজকেও ধ্বংস করবে। আজ নিজেরা চরম বিপদের মধ্যে পড়েছে বুঝতে পেরে—বিশ্ব পরিবেশ দিবস আন্দোলন, বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রতিরোধে আন্দোলন—এত কিছু করার পরও নিজেদের বাণিজ্যিক ও ভোগবাদী স্বার্থ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য এই সমস্ত দেশগুলি কোনও স্থায়ী চুক্তিতে আসছে না।

এমত অবস্থায় সারা বিশ্বকে বাঁচাতে পারে এবং মানব সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে একমাত্র "হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি। বাকি ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম ও সমাজ চরম ভোগবাদী ও ধ্বংসকারী। হিন্দু ধর্মে প্রকৃতি পূজা—ত্যাগবাদী ও সবার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনকারী। সবার বেঁচে থাকার অধিকারে বিশ্বাসী। সারা পৃথিবীর মানুষ বাঁচবে ও পৃথিবীকে বাঁচাতে সাহায্য করবে।

শংকর প্রামাণিক , কাশীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

অযোধ্যা বিতর্ক

সম্প্রতি অয্যোধ্যা বিতর্ক পুনরায় বহুভাবে আলোচিত হচ্ছে। সেকুলার-পন্থীরা এই বক্তব্যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বসিত যে ১৭ বছরে অযোধ্যা নিয়ে রাজনীতি হলেও ওই অঞ্চলের কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। তাই এখনই ওই স্থানের উন্নয়নের জন্য তারা তৎপর। খবরে প্রকাশ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ৩৩০ কোটি টাকার ডেভলেপমেন্ট প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন অযোধ্যার উন্নয়ন কল্পে। ওই টাকায় গড়ে উঠবে আন্তর্জাতিক রামলীলা কেন্দ্র, একটি বৌদ্ধ বিহার ও একটি রামকথা যাদুঘর। অর্থাৎ রামচন্দ্রের জন্মভূমিতে পর্যটন শিল্প যাতে বৃদ্ধি পায় সরকার তার জন্যে তৎপর। অযোধ্যা যে রামচন্দ্রের জন্মভূমি সে বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান সরকারেরও কোনও দ্বিমত নেই। তাহলে প্রশ্ন হল, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে বাধা কোথায়? যে বিতর্কিত (?) জমি ঘিরে এত আয়োজন সেখানে যদি আবার মসজিদ তৈরি হয় তা হলে রামলীলা কেন্দ্র এবং রামকথা যাদুঘর তৈরির যৌক্তিকতা কোথায়? অর্থাৎ, দেশের প্রত্যেকে ওই স্থানে রামমন্দির চাইলেও তা করা যাবে না। কারণ, রামমন্দির আন্দোলনে সঙ্ঘ-পরিবার ও বিজেপির সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। যেন-তেন প্রকারেণ সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপির বিরোধিতা এখন বর্তমান অবিজেপি দলগুলির লক্ষ্য। তারা হিন্দু-সেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী, আগ্রহী রাজনীতি করতে। কিন্তু আপামর হিন্দু জনতার চাহিদা 'রামমন্দির নির্মাণ' প্রশ্নে বিরোধিতা করার জন্যও অগ্রণী। এই সারসত্য হিন্দুরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল।

রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

আসন্ন বিপদ

হিন্দু-হিন্দুত্ব-হিন্দুধর্ম আজ চারদিক থেকে আক্রান্ত। আর ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে দেশব্যাপী কী গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একদিকে বিশ্বের খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলো হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ভারতে হিন্দু সংখ্যা হ্রাস করে খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। হিন্দুরা দলে দলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে মুসলমানরা ভারতে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে শরিয়তের দোহাই দিয়ে। সরকারি জন্মনিয়ন্ত্রণ অমান্য করে একাধিক বিয়ে করে এবং ততোধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে। এছাড়া, হিন্দু মেয়েরা মুসলমান ছেলেদের বিয়ে করে এবং হিন্দু ছেলেরা মুসলমান মেয়ে বিয়ে করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি কম্যুনিস্ট কংগ্রেস প্রভৃতি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের নেতারা মুসলিম Vote-Bank হস্তগত করার জন্য মুসলমানদের পদলেহন করে হিন্দুদের একটা বিরাট অংশকে হিন্দু-হিন্দুত্ব-হিন্দুধর্ম বিরোধী করে তুলেছে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। এইসব উপায়ে যদি খৃষ্টান ও মুসলমান জনসংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং Family Planning-এর মাধ্যমে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং পাচ্ছেও, তবে ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হতে খুব একটা অধিক সময় লাগবে না। তাই বলছিলাম, হিন্দুদের সামনে আজ ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

শিশির প্রিয়োপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি।

হিন্দু পদ্ধতি

কোনও শিশুর জন্মদিনে আমরা ভগবানকে পূজা ও প্রার্থনা না করে—বিদেশীদের অনুকরণে কেক কাটছি, আবার সেই শিশুকে দিয়েই তার জন্মদিনে জ্বালানো বাতি নিভিয়ে দেওয়াচ্ছি। এটা হিন্দু মতে অশুভ এবং অবশ্যই অমঙ্গল কাজ। সেই বাতি নিভিয়ে দেবার পর সবাই মিলে হাততালি দিচ্ছি এবং আনন্দ প্রকাশ করছি।

আজও আমরা জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, খৃষ্টানদের পবিত্র দিন—"রবিবার" দিনটিকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে পালন করে চলেছি। অথচ আমাদের হিন্দুদের কাছে সব থেকে পবিত্র দিন হলো বৃহস্পতিবার। এটা এতই পবিত্র দিন যে, একে অনেকে গুরুবার বলে থাকে।

ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারা—আমাদের হিন্দুদেরকে পবিত্রতম জিনিসগুলিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য "গোমাতাকে" রাষ্ট্রীয় পশু হিসাবে ঘোষণা না করে, "বাঘকে" জাতীয় পশু হিসাবে ঘোষণা করেছে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষ হিন্দুদেরকে এতটাই গ্রাস করেছে যে, দুর্গাপূজাকে দুর্গোৎসব না বলে শারদোৎসব নামে ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার করা হচ্ছে।

এর সাথে হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জনের দিন ব্যাপক মদ্যপান (ছোট ও বড়) ও চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ চলে।

এই সমস্ত আচরণের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান টিভি-চ্যানেলগুলি। হিন্দুদের এই সমস্ত আচরণের ফলে—সাধারণ হিন্দুরা, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেইজন্য আমরা যারা হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পবিত্রতার চোখে দেখি—তাদেরকে উপরোক্ত আচরণগুলি বর্জন করে, হিন্দু শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচরণগুলি করতে হবে। যাতে করে বাকি হিন্দু সমাজের কাছে সঠিক আচরণের পথ নির্দেশ করে। এই কাজে সকল নিষ্ঠাবান হিন্দু ও হিন্দু সংগঠনগুলির কর্মীদেরকে নিজেদের ঘর থেকে সঠিক আচরণ করতে হবে ও শিশুদেরকে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

পৃথিবীর বড় অসুখ

গোপীনাথ দে

পৃথিবী খুবই অসুস্থ। পৃথিবীর জলবায়ু, আবহাওয়া, উষ্ণতা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটছে। আর এই পরিবর্তনের জন্য মানব সমাজই দায়ী। এই পরিবর্তনের কারণে শুধু মানব সমাজই নয় পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত বিপন্ন হওয়ার মুখে। আর সেই কারণে পৃথিবীর ১৯৪টি দেশের ৩৬ হাজার প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয়ে গেল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে। সম্মেলন চল্‌ল ১২ দিন ধরে, খরচ হল প্রায় সাড়ে একুশ কোটি মার্কিন ডলার। বিপন্ন এই পৃথিবী, বিপন্ন এই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে রক্ষার জন্য বিরাট এই সম্মেলন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উপাদানগুলির আয়তনের অনুপাত হল ঃ

১। অক্সিজেন—	২০.৬০ক্স
২। নাইট্রোজেন—	৭৭.১৬ক্স
৩। জলীয় বাষ্প—	১.৪০ক্স
৪। (আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটনজেন) অন্যান্য গ্যাস—	.৮০ক্স
৫। কার্বন ডাই অক্সাইড—	.০৪ক্স
	১০০.০০ক্স

কিন্তু গোল বেধেছে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু অন্যান্য গ্যাস নিয়ে। একথা আমরা জানি উদ্ভিদকুল বাতাসের ঐ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে নেয় এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। আর প্রাণীকুল অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। এবং এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হয় যাতে স্বাভাবিক ভাবে উপরে দেওয়া বায়ুমণ্ডলের অনুপাত যথাযথভাবে ঠিক থাকে। মানুষের প্রয়োজন, চাহিদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ার কারণে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে আর সেই কারণে কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদিতে কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে এবং অফুরন্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিদকুল (বনভূমি) শোষণ করে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে বাতাসের ভারসাম্য (অনুপাত) ঠিক রাখতে পারত যদি সেই অনুপাতে বনভূমি বৃদ্ধি পেত। কিন্তু বাস্তবে বনভূমি বৃদ্ধি করা দূরের কথা উল্টে বনভূমি ধ্বংস করে চলেছে মানব সমাজ। তাই ঘটতে চলেছে বিপত্তি।

১৯৯৭ সালে কিয়োটো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বস্তুত কার্যকরী হয়নি। তাই কোপেনহেগেনের এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বিশ্বের এই ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন—"কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড অফ ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯"-কে ঘিরে কৌতূহল ও আশা ছিল অনেক। কিন্তু সব দেশের প্রতিনিধিরা "কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড" দেখার পর সেই আশার আলো কমে আসে।

বিশ্বের জলবায়ু বা আবহাওয়া যাতে দূষিত পরিবেশ বর্জিত হয় সেই বিষয়ে আবহাওয়া গবেষক অনেকের মতামত—শিল্পোন্নত বৃহৎ রাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা এই সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং করছে। তাই তাদেরই এই সমস্যা সমাধানের খরচ ও ক্ষতি বা বোঝা বহন করতে হবে। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপ ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি এই যুক্তি মানতে রাজি নয়। যখন মহাসম্মেলন ব্যর্থ হতে চলেছে তখন মুখরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুন জানালেন, "শেষ পর্যন্ত আমরা একটা চুক্তিতে সীলমোহর লাগালাম। যা যা আশা করেছিলাম, এতে সব নেই বটে, তবু চুক্তিকেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বলে ধরছি।" ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রাজিল মিলিতভাবে একটি খসড়া চুক্তি রূপায়ণ করে, যাতে সমর্থন দেন আমেরিকার প্রধান বারাক ওবামা। উপায়ান্তর না দেখে স্বাগত জানায় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান বান কি মুন এবং একই সঙ্গে বলেন "এই চুক্তি আগামী বছরেই আন্তর্জাতিক স্তরে আই সি মোড়ক

দিতে হবে।"

চুক্তিতে কি আছেঃ—

প্রথমত—শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যা ছিল, তার থেকে বর্তমানে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কোনও ভাবেই যেন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস না বাড়ে, সে দিকে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত—২০১০ সালের মধ্যে ৩০০ কোটি ডলারের আবহাওয়া পরিবর্তন ঠেকানোর তহবিল গঠনের চেষ্টা।

চতুর্থত—উন্নতি ও উন্নয়নশীল দেশের উষ্ণায়ণ ঠেকানোর পদক্ষেপ সংক্রান্ত স্বচ্ছ রূপরেখা তৈরি হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

চুক্তির শর্তগুলি দেখে বিতর্ক আর মতান্তরে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে বেলা সেন্টারের সম্মেলন স্থান। নিকারাগুয়া, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, সুদানসহ ১৩০ ছোট দেশ ভারত-আমেরিকা সমর্থিত এই চুক্তিকে আত্মঘাতী আখ্যা দিয়ে জানায়, "এত খারাপ চুক্তি এর আগে পরিবেশ রক্ষার কোনও সম্মেলনে আসে নাই। সব কিছু দেখে শুনে শুধু আমেরিকা নয়, ভারত ও চীনও এই চুক্তিকে বাস্তবায়িত করতে চাইছে ২০১০ সালের মাঝামাঝি মেক্সিকো সম্মেলনে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন তো শেষ হল কোনও কার্যকরী পরিকল্পনা ছাড়াই। বিশ্বের তো বটেই ভারতেরও তাবড় তাবড় বিখ্যাত নেতারা কিছু কার্যকরী পরিকল্পনার কথা সেখানে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলো। যদিও সনাতন ভারতবর্ষে এ ব্যাপারে অনেক গবেষণা হয়েছে। অতীত কালে। এবং সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও দেওয়া আছে এইসব সমাধানের জন্য।

বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যখন বৃক্ষ রোপন ও বন সৃজন-এর কথা বল্‌ল তখন আমরাও বৃক্ষরোপনে উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু আমাদের দেশে যে যুগযুগ ধরে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে বট, অশ্বত্থ ও পঞ্চ বটী প্রভৃতি ধর্মীয় আদলে তাকে কিন্তু আমরা আদপেই গুরুত্ব দিই নাই, বরং ওটাকে কুসংস্কার হিসাবে গণ্য ও প্রচার করার রেওয়াজ চালু আছে। আজকের যেটা কঠিন সমস্যা জলবায়ু দূষণ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তারও সমাধান সনাতন ভারতবর্ষে বহু আগে থেকে দেওয়া আছে। সে সমাধান হল "তুলসী গাছ"। যেভাবে বনসৃজন ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রসার ঘটানো হয়েছে, ঠিক সেইভাবে ব্যাপকভাবে দেশে দেশে "তুলসী গাছ" রোপন আন্দোলন রূপে ছড়িয়ে দিতে পারলে পৃথিবীব্যাপী বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলির ভারসাম্য অবস্থা ফিরে আসবে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়।

প্রাচীন বিশ্বে মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তারমধ্যে ভারতে ছিল তিনটি যথা—তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, এবং নালন্দা এবং অপরটি ছিল চীন দেশে—নামজিও বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মধ্যযুগে বিদেশী আক্রমণকারীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং অধ্যাপকগণ নিহত হল। কিন্তু কিছু কিছু গুণী সমাজের কল্যাণের জন্য এবং সমাজের প্রয়োজনের জন্য ধর্মীয় আদলে চালু রেখেছিল তখনকার গুণীজনেরা। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তুলসী পূজা। এই ছোট্ট উদ্ভিদটি যদি ধর্মীয় আদলে সংরক্ষিত না থাকত তবে, কবে কোন অতীতে বিলুপ্ত প্রজাতির বৃক্ষের সঙ্গে "তুলসী গাছ"ও বিলুপ্ত হয়ে যেত। এই প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই ধর্মীয় আদলে রেখে পূজার ব্যবস্থা করা আছে।

এই গাছের অনেক ঔষধি গুণ ছাড়াও বায়ুদূষণ রোধ করার ক্ষমতা অপরিসীম। ভারতের পণ্ডিতগণ তুলসী গাছ বপনের প্রস্তাব দেন নাই, কারণ হয়তো সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবার ভয়ে। সম্প্রতি জানা গেল মথুরার শোধনাগারে দূষণ থেকে "তাজমহল"কে বাঁচাবার জন্য তাজমহলের উঠানে কয়েক হাজার তুলসী গাছ লাগান হয়েছে। তাহলে সারা বিশ্বে সকল দেশে এই ব্যবস্থা চালু করতে অসুবিধা কোথায়!!

পরম্পরা

হরিদ্বারে এবার পূর্ণকুম্ভ

বিমল মুখোপাধ্যায়

সমুদ্র মন্থন স্থল হতে অমৃতভরা ভাণ্ড নিয়ে পালাবার সময় দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবলোকের আট স্থানে এবং মর্ত্যধামের চার স্থানে অমৃতভরা কুম্ভ রেখে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই চারস্থান হলো, হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী। সেই কারণে এই চারস্থানে পূর্ণকুম্ভ যোগের স্নান হয় ও মেলা বসে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেশ্চ ধারা গোদাবরীতটে।
কলসখ্যোহি যোগহয়ং প্রোচ্যতে
শঙ্করাদিভিঃ॥"

হরিদ্বারে ২২ বছর আগে পূর্ণকুম্ভের স্নান হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ১২ বছর পর ২০১০ সালে পূর্ণকুম্ভের স্নান পুনরায় হবে। হরিদ্বারে কুম্ভযোগের স্নান শুরু হয় বসন্তকালে বিষুব-সংক্রান্তিতে। অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং রবির সঙ্গে মেষ রাশির মিলনে হরিদ্বারে অমৃত কুম্ভ যোগ হয়। এখানে উল্লেখ থাকে দেবা-সুরের সংগ্রামকালে এই অমৃতভরা কলস রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন—সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি। সেই কারণে উক্ত তিনের সংযোগে বিশেষ, বিশেষ রাশিতে অবস্থান কালে কুম্ভ যোগ হয়।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত একটানা ৩ দিন দৌড়ানোর পর বিশ্রামের প্রয়োজনে অমৃত ভরা কুম্ভটি এক-এক স্থানে রেখেছিল। এই ভাবে ৪ স্থানে পৌঁছাতে ১২ দিন সময় লাগে। অর্থাৎ ৩ দিন ৪ স্থান ঃ ১২ দিন। সর্বশেষে পুনরায় মন্থন স্থলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখানে স্মরণ রাখতে হয় দেবতাদের দ্বাদশ দিবস তুল্য হয় মানুষের দ্বাদশ বৎসর সম।

স্কন্দ পুরাণে সমুদ্র মন্থনের স্থান কালের বর্ণনা দেওয়া আছে—

"আতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি, কলসো মূর্তমান।
উত্তরে হিমবৎ পার্শ্বে ক্ষীরোদ নাম সাগর॥
মন্থং মন্দারং কৃত্ব নেত্রং কৃত্বাতু বাসুকিম্।
সখান্তং সুধয়া পূর্ণং সবেবযাংহি মনোহর॥

হিমালয়ের উত্তরে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে অমৃত ভরা কুম্ভ উঠে এসেছিল। এবং সেই অমৃত পান করে দেবতারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন।

কেন এই সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, এর কারণ কি ছিল? এ সম্পর্কে জানা যায়—একদিন দেবরাজ ইন্দ্র চলেছিলেন ঐরাবতের পিঠে চড়ে। পথে দেখা হল মুনি দুর্বাসার সঙ্গে। দুর্বাসা মুনি সুরপতি ইন্দ্রকে সমাদর দেখিয়ে নিজের গলার পারিজাত মালাটি খুলে ছুঁড়ে দিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। ইন্দ্র কৌতুক ছলে মালাটি লুফে নিয়ে স্থাপন করলেন প্রিয় বাহন গজরাজের সুসজ্জিত মাথায়। গজরাজ নিজের খেয়ালে মাথা নেড়ে সেই মালা মাটিতে ফেলে পদদলিত করে চলতে শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তে দুর্বাসার দ্বিতীয় রিপু জাগ্রত হল। এবং দেবরাজকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করে তোমার অহংকার হয়েছে। আজ হতে আমার অভিশাপে শ্রীভ্রষ্ট হল স্বর্গ রাজ্য। এবং লক্ষ্মী নিমজ্জিত হল জলধিতলে।

শ্রীভ্রষ্ট হবার সুযোগে, অসুর কুল স্বর্গরাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করল। এই সংবাদে দেবতাগণ বিচলিত ও সংকটাপন্ন হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন এবং সংকট মোচনের পথ নির্দেশ প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হলেন পরামর্শ গ্রহণের জন্য। শ্রীবিষ্ণু সবিস্তারে শ্রবণ করে সমুদ্র মন্থনের নির্দেশ দেন। এবং এর ফলে সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠবে, সেই অমৃত পান করে দেবতারা পুনরায় শ্রীযুক্ত হবেন এবং স্বমহিমায় স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করতে পারবেন। কিন্তু এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা একা দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অসুরদেরও সঙ্গে নিতে হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের আরও পরামর্শ দিলেন—"যূয়ং তদনুমোধবং যদিচ্ছন্ত্য সুরাঃ

সুরাঃ"।—মন্থনকালে অসুররা যা চাইবে তাদের জন্য মৌখিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ো। দেবতারা শ্রীবিষ্ণুর নিকট জানতে চাইলেন, দৈত্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে সমুদ্র মন্থন করা উচিৎ হবে কিনা? ভগবান শ্রীবিষ্ণু তখন দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—হে দেবতাগণ! আমার সাহায্যে তোমরা অনলস হয়ে সমুদ্র মন্থন কর। এ ব্যাপারে অসুরগণ কেবল ক্লেশ ভোগী হবে, আর তোমরা ফল ভোগ করবে। (শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতের আদি পর্বে সমুদ্র মন্থন কাহিনি বলা আছে)।

অসুররাজ বলিকে আহ্বান জানানো হল। অসুররাজ বলি এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। শুরু হল সমুদ্র মন্থনের প্রস্তুতি পর্ব। একে একে সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ হল। মন্থনের জন্য মন্দার পর্বত মন্থন দণ্ড হল। কূর্ম্ম অবতার নিজ পৃষ্ঠে মন্দার পর্বতকে ধারণ করলেন। নাগ বাসুকি হলেন মন্থন রজ্জু। চুক্তি হল মন্থনকালে যে সব দ্রব্য উঠে আসবে তা সমবন্টন করা হবে উভয় পক্ষকে।

নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু উভয়পক্ষকে সতর্ক করলেন—মন্থনকালে অনেক মূল্যবান রত্ন উঠে আসবে তাতে প্রলুব্ধ হয়ে মন্থন কার্য বন্ধ করে দিও না। সর্বশেষে লক্ষ্মী ও অমৃত লাভের আশায় মন্থন কার্য চালিয়ে যেও।

শুরু হল মন্থন কার্য। দেবতারা চালাকি করে নাগ-বাসুকির লেজের দিক ধরল। অগত্যা অসুররা থাকল নাগ-বাসুকির মুখের দিকে। ঘর্ষণকালে বাসুকির গর্জনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। এমনকী বাসুকির দেহের ঘর্ষণে মন্দার পর্বতে আগুন লাগল। সেই আগুন নেভার জন্য দেবতারা আকাশ হতে বৃষ্টিপাত ঘটাল। নাগ বাসুকির মুখ এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গরল বা বিষ নির্গত হওয়ার কালে বহু অসুর মারা গেল।

প্রথমেই হলাহল নামক বিষ উঠল। এই বিষের প্রভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হয় হয়। দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের কাছে হাজির হলেন। মহাদেব সৃষ্টি রক্ষার্থে বিষ পান করলেন। তাঁর কণ্ঠ বিষের প্রভাবে নীল বর্ণ হল। শিব হলেন নীলকণ্ঠ।

অবশেষে পর্যায়ক্রমে উঠে আসতে থাকে সুরভি (গাভী) উচ্চৈঃশ্রবা (অশ্ব) ঐরাবৎ (আটটি হাতি), কৌস্তভ (মণি) পারিজাত (কল্পতরু), অপ্সরা, লক্ষ্মী, অন্নময়ী সুরা, সর্বশেষে অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন দেব বৈদ্য ধন্বন্তরী। প্রথমের ৬টি দ্রব্য দেবতারা কৌশল করে কুক্ষিগত করে নিল। পড়ে রইল অন্নময়ীসুরা ও অমৃত ভাণ্ড। 'অন্নময়ী' সুরা অসুররা আকণ্ঠ পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে রইল।

দেবতারা জানতেন এই পরম মূল্যবান ধন অমৃতের কথা। এই অমৃত পান করলে অমর হওয়া যায়। অতএব অসুররা যাতে এই পরম বস্তু পান করতে না পারে তার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তকে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে চম্পট দিতে বললেন। জয়ন্ত সেই অমৃত ভরা কুম্ভ নিয়ে পালানোর সময় বিশ্রামের জন্য এই হরিদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার জন্য হরিদ্বারে কুম্ভ স্নান হয়।

জয়ন্ত অসুরদের তাড়া খেয়ে ৪ স্থান ঘুরে ১২ দিন পরে মন্থনস্থলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। অসুর কুলের গুরুদেব শুক্রাচার্যের নির্দেশে দানবগণ অমৃতের ভাগ ছাড়তে নারাজ। ফলে যুদ্ধ বাধল দেবতা ও অসুরদের মধ্যে। যুদ্ধ হল ১২ দিন ব্যাপি। অবশেষে সন্ধি হল। শ্রীবিষ্ণুর পরমা সুন্দরী মোহিনী রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর হাতে কুম্ভটি তুলে দিলেন সমবন্টনের জন্য। তখন মোহিনী রূপী নারীর বেশে নারায়ণ জানালেন—"যদ্যজুনেত কৃষাধব সাধুবা কৃতং ময়া যো বিভজে সুধামিমাং"। অর্থাৎ আমি যা করব তা ভাল মন্দ বিচার না করে মেনে নেবে। তোমরা এই প্রতিশ্রুতি দিলে আমি ন্যায়সম্মত ভাবে অমৃত ভাগ করে দেব। তাঁর রূপে মোহগ্রস্ত অসুরকুল—'তথাস্তু' বলে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এবং ভাবল নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাবে। ন্যায়োচিত কাজ ইনি করবেন। ছদ্মবেশ রূপী শ্রীবিষ্ণু 'অমৃত ভাণ্ডটি' দেবতাদের হাতে দিলেন এবং 'অন্নময়ী' সুরা পাত্রটি প্রদান করলেন অসুরদের হাতে। কোন পক্ষকেই বঞ্চিত করলেন না। অমৃত পান করে দেবতারা হলেন অমর।

এই হট্টগোলের সময় সুযোগ সন্ধানী রাহু দেবতাদের ছদ্মবেশে এক চুমুক অমৃত পান করেছিল। এই দৃশ্য পাহারা দ্বার চন্দ্র ও সূর্য দেখে বিষ্ণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর শিরচ্ছেদ করলেন। যেহেতু রাহুর উদরস্থ হবার আগে শিরচ্ছেদ হয়েছিল সেই কারণে রাহুর মুণ্ডুটি অমর। এর ফলে রাহুর চিরকালের শত্রু হয়ে রইল চন্দ্র ও সূর্য।

শাস্ত্র বলে হরিদ্বারে কুম্ভস্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না। হরিদ্বারে হর-কি-পৌড়ি ঘাটে কুম্ভস্নান পর্ব চলবে। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধার্মিক ভর্তৃহরির স্মৃতিতে এই ঘাটটি নির্মাণ করেন। রাজা মানসিংহ এর উন্নতি সাধন করেন। ইংরাজ আমলেও এর সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এই ঘাটটির প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন।

আগামী ১৪ই জানুয়ারী ২০১০ সালে এই হরিদ্বারে কুম্ভস্নান পর্বের সূচনা হবে। আখড়া পরিষদ ও মেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী ১২ই ফেব্রুয়ারী (২৯শে মাঘ শুক্রবার) মহাশিব রাত্রির সময় প্রথম স্নান শুরু। ১৫ই মার্চ সোমবার (সোমাবতী অমাবস্যার) যোগে শাহীস্নান। ২৪শে মার্চ রামনবমীতেও হবে পর্ব স্নান। ৩০শে মার্চ চৈত্র পূর্ণিমায় বৈরাগী সম্প্রদায়ের স্নান। এরপর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের সর্বোত্তম শাহীস্নান ১৪ই এপ্রিল (চৈত্র সংক্রান্তি) বা মহাবিষুব সংক্রান্তির স্নান। এই দিনের স্নানে সবসম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী চার মঠের শঙ্করাচার্য্যগণ অংশগ্রহণ করবেন। আর অংশগ্রহণ করবেন সারা ভারতের মানুষ এবং শত শত বিদেশী-বিদেশিনী। এবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে পাঁচ কোটির বেশী মানুষ সমবেত হবেন। মেলা কর্তৃপক্ষের সেইরূপ অনুমান। কুম্ভ হল ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মা।

পুরাণে এই স্থানকে ভূ-স্বর্গ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাপ্রস্থানের যাত্রা পথের প্রথম সোপানে এই হরিদ্বার। মহাভারতের যুগে হরিদ্বার ছিল বাণপ্রস্থ আশ্রম। হিমালয়ের চূড়ায় কেদারনাথ শিব এবং বদ্রীনারায়ণ অবস্থান করছেন। এই দু' স্থানের যাত্রাপথ শুরু এই স্থান হতে। সেই কারণে এই স্থান হরিদ্বার বা হরদ্বার নামে পরিচিত। হরিদ্বার হল গঙ্গা, হিমালয় ও কুম্ভ যোগে স্নান—এই ত্রিধারার মহিমায় মহিমান্বিত স্থান। মহাভারতের শ্লোকে হরিদ্বারে গঙ্গা সম্পর্কে বলা আছে—

সর্বত্র পাবনী গঙ্গাত্রিষুস্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে'॥

অর্থাৎ গঙ্গা সর্বত্র পাবনী বটে, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তিনি অধিক পুণ্যময়ী। এই গঙ্গায় কুম্ভযোগে স্নানের জন্য সবারে করি আহ্বান।

স্মৃতির মণিকোঠায় 'সাকুরা'

(৯ পাতার পর)

যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়ে বিশ্ব-দরবারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়েন্ট (শিল্পদৈত্য) নামে সগর্বে মাথা তুলে দণ্ডায়মান। জাপানীদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় কোনও পাতাল পুরীর রাজপ্রাসাদের ভোটবাজি নয়তো বা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় কোনও যাদুকরের ভেল্‌কি। জাপানের ব্যবস্থাপনাকে কল্পনায় পুরে রাখা সত্যি দুরূহ মনে হয়। এ যেন স্বপ্নলোকের জলছবি যা পলকে মিলিয়ে যায়, সেই ছবিকে গতিশীল করে এরা বাস্তব জীবনে প্রত্যহ ব্যবহার করছে। সাংস্কারগত দিক দিয়ে এরা এশিয়া ঘেঁষা, হিন্দুরা বৌদ্ধ সৌন্দর্যের শিরোমণি সাকুরাকেই বা এড়াবেন—কি করে? সঙ্গে ফুজিয়ামা পর্বতের শৃঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগরের গঢ় নীলরঙের প্রবল ঢেউয়ের আকুলিবিকুলি, চীনে সাগরের মাথা ফুঁড়ে রক্ত প্রবালপাহাড়, হিরোসিমার এ্যাটম বোম মেমোরিয়াল আর পাহাড়ে ঘেরা টোপে নাগাসাকির অনাবিল সৌন্দর্য—এসব ভাষায় বর্ণনা অত্যন্ত কঠিন।

তাই বলি, যদি সুযোগ সুবিধা আসে আপনার, একবার গিয়ে চাক্ষুষ সাক্ষী হয়ে আসুন। মনে হবে আমরা কত যুগ পিছিয়ে আছি। পরীর রাজ্যের কাহিনী স্বচক্ষে দেখে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

বোধ কথা

দেশভক্ত সন্ন্যাসী

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেই সভাতেই বিবেকানন্দ স্বল্প সময়ের ভাষণে আমেরিকাবাসীর মন জয় করে নেন। সর্বত্র তাঁর প্রশংসা ও হিন্দুধর্মের জয়জয়কার হয়।

একদিন এক আমেরিকান দম্পতি তাঁকে তাদের বাড়িতে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী তাঁদের অনুরোধে সম্মতি দেন। সেই বাড়িতে গিয়ে ভোজন করেন। একটি আলাদা ঘরে ভালো বিছানায় তাঁর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়। পাশে অন্যঘরে গৃহকর্তারা ছিলেন। মাঝরাতে কান্নার আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে না পারলেও তাঁরা স্বামীজীর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ টের পান। সস্ত্রীক গৃহকর্তা গিয়ে স্বামীজীকে কাঁদতে দেখেন। প্রথমে তাদের মনে সন্দেহ হল যে, হয়ত বা থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকমতো না হওয়াতে স্বামীজী কষ্ট পেয়ে থাকবেন। স্বামীজীর চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছিল। কুণ্ঠিতভাবে তারা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, আমাদের কোনও ত্রুটী হয়েছে? আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।' তাদেরকে দেখে স্বামীজী সামান্য হতচকিত।

একটু লজ্জাও পেলেন। জোর করে কান্না রোধ করে বললেন, 'আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম। আপনাদের সব ব্যবস্থাই খুব ভালো। আপনাদের দেওয়া উত্তম আহার্য ও শয্যা দেখে আমার নিজেরই আমার গরীব দেশবাসীর কথা মনে পড়ে গেল। তাদের অনেকের একবেলা ভরপেট ভোজন হয় না। আর শীতকালে ভালো বিছানা, গায়ের কাপড় বা মাথায় উপরে ছাদও নেই। ওই সব দেশবাসীর কথা আমার মনে পড়ছে। সেজন্যই আমার মনে কষ্ট।" এরকমই ছিল আমাদের সবার প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও তাদাত্ম্য অনুভব।

তিনিই যথার্থ প্যাট্রিয়ট মংক—দেশভক্ত সন্ন্যাসী। কথাটা সোনার পাথরবাটির মতো শোনালেও যথার্থ রাষ্ট্রপুরুষ। জননেতা, জনতা যাঁর হৃদয়ে। এজন্যই তিনি সর্বকালে সর্বদেশে পূজ্য। যথার্থ দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশবাসী তাঁর কাছে একাকার। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তি চাইবি না। বটগাছ হয়ে সকলকে ছায়া দিবি।' স্বামীজী সেই গুরুবাক্যই হৃদয়ে ধারণ করে, আচরণ করে গুরুভাইদেরও সেকথা বলে গিয়েছেন। তাই তিনি সবার স্বামীজী।

।। চিত্রকথা ।। মহাবলী ।। ২

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

ক্যাঙারুর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

ক্যাঙারুদের মধ্যেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আছে। অর্থাৎ ভ্রূণের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে এদের। স্ত্রী ক্যাঙারু একসঙ্গে পাঁচ-ছটি বাচ্চা ধারণ করতে পারে। কিন্তু কখনই একসঙ্গে একাধিক বাচ্চা প্রসব করে না। কারণ একের বেশি সন্তান তার মারসুপিয়াম থলিতে ধরে না। যতদিন পর্যন্ত ওই থলিতে একটি বাচ্চা বড় না হচ্ছে, ততদিন সে ভ্রূণের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। একটি বাড়ে মারসুপিয়াম থলিতে আর একটি বাড়ে গর্ভে, যা পৃথিবীর আর কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অনশনে দশ বছর

পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে মণিপুরের বেশ কিছু অংশে ২০০০ সালের নভেম্বরে এক আন্দোলনের জেরে অসম রাইফেল প্যারামিলিটারি ফোর্সের হাতে মারা যান ১০ মণিপুরী। প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন ইরম চানু শর্মিলা নামে এক মহিলা এবং তার তিনদিন পর আত্মহত্যা করার চেষ্টার অপরাধে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে শর্মিলাকে ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন ইত্যাদির স্যাপ নাক দিয়ে খাওয়ানো শুরু হয়। কিন্তু অনশন ভাঙানো যায়নি। ২০০৬-এর ২ অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনে মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজঘাটে গান্ধীজির সমাধিস্থলে যান এবং তারপর যন্তরমন্তরে গিয়ে ফের অনশনে বসেন। সেখান থেকে গ্রেফতার করে এনে শর্মিলাকে অল ইন্ডিয়া ইন্স্টিটিউট অব্ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ ভর্তি করা হয়। সেখানে এখনও চলছে অনশন। গত নভেম্বরে সেই অনশন দশ বছরে পা দিল।

শব্দ থেকে বিচিত্র শব্দ

শব্দ পাল্টে পাল্টে তৈরি হয় নতুন আর বিচিত্র সব শব্দ। যেমন—হিন্দিতে 'রাব' শব্দটির অর্থ জ্বাল দিয়ে ঘন করা রস। সংস্কৃত শব্দ 'দ্রব' থেকে দ্রাব হয়ে সৃষ্টি হয়েছে 'রাব' শব্দটি। রাব-এর সঙ্গে 'ড়ি' যোগ হয়ে তৈরি হয়েছে 'রাবড়ি'। শব্দটি বাংলায় এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে।

ক্রিসমাস আছে যিশু নেই

নাৎসী জার্মানিতে ক্রিস্‌মাস ক্যারল যীশুখৃস্টকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে তার জায়গায় প্রকৃতির বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছিল। ক্রিসমাসকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মান উৎসব 'জুলফেস্ট'-এর সঙ্গে। ফলে ক্রিসমাস ট্রি হয়ে যায় 'জুল ট্রি', ক্রিসমাস ট্রি-এ তারার জায়গা নেয় সূর্য। এবং হিটলারের পতনের এত বছর পরেও অনেক জার্মান পরিবার এখনও ক্রিসমাসের এই নাৎসী সংস্করণই মেনে চলেছেন।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক—বলতো বিদ্যুৎ আবিষ্কার না হ'লে আমাদের কী কী অসুবিধে হত?

ছাত্র—আমাদের মোমবাতি জ্বালিয়ে টিভি দেখতে হ'ত স্যার।

* * *

রোগী—ডাক্তারবাবু, আমাকে পরীক্ষা করে বলুন তো আমার কী হয়েছে?

ডাক্তার—আপনার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল।

রোগী—কী করে বুঝলেন?

ডাক্তার—কারণ বাইরে বোর্ডে লেখা আছে 'পশুচিকিৎসক'।

* * *

লাল্টি —ভি আই পি মানে কিরে?

বাল্টি — তাও জানিস না! ভি আই পি মানে হল ভোটের সময় ইহাদের পাওয়া যায়।

* * *

জংশন স্টেশনে ট্রেন এসে থামলে এক যাত্রী গলা হাঁকিয়ে বললেন, 'এ্যাই চা-অলা, এক গজ চা দেখি।'

চা-অলা—একগজ চা-বস্তুটা কী?

যাত্রী—তিন বার ফোটানো চা তো! তিন ফুটে এক গজ!

* * *

শিক্ষক—কী আঁকছ হে?

ছাত্র—ভগবানকে।

শিক্ষক—কিন্তু ভগবানকে তো কেউ দেখেনি!

ছাত্র—আমি আঁকলেই সবাই দেখতে পাবে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। হিন্দু-কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিওর অনুগামীরা কী নামে পরিচিত ছিলেন?

২। উত্তর মেরুতে সবচেয়ে বড়দিন কোন্‌টি?

৩। বালি আছে টালি আছে/আর আছে বাটা / তিনটি অক্ষর নিয়ে/কাঠ যায় কাটা—কী সেই শব্দ?

৪। কোন্ উল্কাপিণ্ডে সিলিকন ও অক্সিজেন থাকে?

৫। কোন্ ভারতীয় ক্রিকেটার প্রথম হেলমেট পরে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন?

—নীলাদ্রি

উত্তরঃ

১। ইয়াং বেঙ্গল
২। ২১ জুন
৩। বাটালি
৪। স্টোনি
৫। মহিন্দর অমরনাথ

গণতন্ত্রের প্রহরীরাই গণতন্ত্রের গলা টিপছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পঞ্চ দশ লোকসভার তৃতীয় তথা শীতকালীন অধিবেশন সদ্য শেষ হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রহরীরাই এখন গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছে। শুধু টিপে ধরছেনয়, সাংসদ হিসেবে তাদের কাজকর্ম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কংগ্রেসের পবন কুমার বনসল এই অধিবেশনের অভিজ্ঞতাকে 'সেম পার্সেন্ট সার্টিফিকেট' দিতে পারেননি। উল্টে বলেছেন, 'সাউন্ড অফ্ ডেমোক্রেসি' চাপা পড়েছে 'রিজন্ অফ্ ডেমোক্রেসী'-তে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন প্রতি মিনিটে যখন কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তখন সাংসদদের উপস্থিতি, সাংসদ হিসেবে তাদের ভূমিকা উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ এতসবের পরেও এদের কোনও লজ্জা বা অনুশোচনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং বেতন-ভাতা সংশোধনের নামে নিজেদের আখের গোছাতেই এরা ব্যস্ত।

অধিবেশনের শুরু থেকেই হাউস উত্তপ্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি বিষয়ে—অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবী, লিবেরহান রিপোর্ট প্রভৃতি। এজন্য উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, ওয়াক-আউটের ঘটনা ঘটেছে বারবার। দু-এক প্রস্থ হাতাহাতিও বাদ যায়নি।

প্রথমেই সংসদের মূল্যবান সময়টুকু কাজে লাগানোর প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। প্রায় ২১ দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে লোকসভাতে কার্যকর সময় ছিল ১০৬ ঘণ্টা। যা নির্দ্ধারিত সময়সীমার ৭৬ শতাংশ মাত্র। আর রাজ্যসভা চলছে ১০২ ঘণ্টা—সেটাও নির্দ্ধারিত মাত্রার ৮৮ শতাংশ। একুশ দিনের মধ্যে ছয়দিন লোকসভার অধিবেশন হয়েছে দৈনিক দু'ঘণ্টারও কম। লোকসভার সাংসদদের উপস্থিতির পরিমাণ ছিল—৫৬ থেকে ৭৫ ভাগ, গড়ে ৬৬ শতাংশ, অন্যদিকে রাজ্যসভায় উপস্থিতির গড় ৬৮ শতাংশ।

শুধু তাই নয়, লোকসভার কার্যবিবরণীর দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪৮ ভাগ সাংসদ, অনেক স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনা হলেও তাঁরা যোগ দেননি। আবার বাদবাকী যে ৫২ ভাগ সাংসদ লোকসভায় যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে পঁচিশ শতাংশ কেবলমাত্র একটি বা দুটি বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যসভার ক্ষেত্রে অর্ধেক সাংসদ (৫০ শতাংশ) সভাতে মুখ দেখিয়েছেন মাত্র, মুখ খোলেননি। এক শতাংশ সাংসদ দশটি বা ততোধিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। লোকসভায় সর্বমোট ৪৪০টি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে মাত্র ১৩১টি প্রশ্নই সভায় উত্থাপিত হয়। তার মধ্যেও মাত্র ৮৭টি প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাওয়া গেছে। কেননা, বাদবাকী প্রশ্নকর্তারাই সঠিক সময়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাজ্যসভার অবস্থা আরও করুণ। রাজ্যসভার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রশ্নকর্তা সংসদে উপস্থিত না থাকলে উত্তর দেওয়া হবে না।

এবার নথিভুক্ত ২৬টি বিলের মধ্যে ১৪টি বিল পাস হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিলগুলির মধ্যে রয়েছে মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা সংশোধন (পড়ুন বৃদ্ধি) বিল।

বলাবাহুল্য, এক একজন সাংসদের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যেমন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় তেমনই সংসদে অধিবেশন চললেও প্রতি মিনিটে কোটি কোটি টাকা সরকারি কোষাগার অর্থাৎ জনগণের পকেট কেটে ব্যয় করা হয়। উপরের বিবরণে সংসদে গিয়ে সাংসদরা কি করেন তার হিসাব-কিতাব দেওয়া রয়েছে। এটিও একটি গবেষণা সংস্থার তৈরি (PRS Legislative Research)।

এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সাংসদরা কেউ ব্যস্ত ক্রিকেট নিয়ে, কেউ অভিনয় নিয়ে তো কেউ সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ নিয়ে। জনসেবকদের জনসেবার সময় কোথায়? এক্ষেত্রে সব দল একাকার। কেউবা ব্যস্ত বই লিখতে। এরকম নামগুলি হলো—এল রাজাগোপাল (অন্ধ্রপ্রদেশ), শত্রুঘ্ন সিন্‌হা (বিহার), বিজয়া শান্তি (অন্ধ্র), সিদ্ধান্ত মহাপাত্র (ওড়িশা), সি পি যোশী (রাজস্থান), তাপস পাল (পশ্চিমবঙ্গ), অনুরাগ সিং ঠাকুর (হিমাচল প্রদেশ), কপিল সিববাল ও বর্তমানে দলহীন যশবন্ত সিংহ।

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় চলচ্চিত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছিলেন পরিচালক বিমল রায়

বিকাশ ভট্টাচার্য

গত বছরটা ছিল চলচ্চিত্রকার বিমল রায়ের জন্মশতবর্ষ। ভারতে সবাক ছবির যাত্রা শুরু ১৯৩০ আর বাংলায় ১৯৩১-এ। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীকে ভারতীয় সিনেমার 'নিউ ওয়েভ' বা নবতরঙ্গের দিক চিহ্ন ধরে নিলে সলতে পাকাবার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে দেবকী বসু, ভি. শান্তারাম, কে.এ. আববাস ও বিমল রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা। গত শতকের চারের দশকে নির্মিত বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' বাংলা সিনেমার নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী একটি ছবি। এখানে পরিচালক কাহিনী নির্বাচনে গতানুগতিকতার ধারা ছেড়ে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিনতা রায়ের অভিনয়েও ছিল আধুনিকতার ছোঁয়া। স্টুডিওর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব পরিবেশে কাজ করায় এ ছবি ভিন্ন চেহারা অর্জন করতে পেরেছিল। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' কাহিনী অবলম্বনে 'অঞ্জনগড়' তিনি তৈরি করেন একসাথে বাংলা ও হিন্দী ভাষায়।

দো বিঘা জমিন

'বম্বে টকিজ' তখন বোম্বাইতে এক নামকরা প্রযোজক সংস্থা। হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর দেবীকা রাণী তখন এই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। বম্বে টকিজের ডাকে বিমল রায়

কলকাতা ছেড়ে বম্বে চলে গেলেন। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) করে বিমল রায় সাড়া ফেলে দিলেন। শুধু জাতীয় সম্মান নয়, ছবিটি আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দেয় তাঁকে। সলিল চৌধুরীর 'রিকশাওয়ালা' গল্প নিয়ে তিনি ছবিটি করেন। যেমন জোরদার কাহিনী, তেমনি তার বিন্যাস। তথাকথিত 'বায়োস্কোপ' ধর্মী চরিত্রকে ভেঙ্গে ভারতীয় ছবিতে বাস্তবসম্মত কিছু করে দেখানোর এক প্রচেষ্টা। তুলে ধরলেন এক হতভাগ্য চাষীর লাঞ্ছনার কথা। বলরাজ সাহানীর প্রাণঢালা অভিনয় এ ছবির অন্যতম সম্পদ।

প্রতিভাবানদের চিনে নেওয়া

তখনকার সময়ে ছায়াছবিতে সেভাবে সিনেমার ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে মুষ্টিমেয় যাঁরা চালুপথে হাঁটতে হাঁটতে কখনও কখনও নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন বিমল রায়। সলিল চৌধুরীর কথাতো বলেইছি। কলকাতা থেকে একে একে ডেকে নিয়েছেন হৃষিকেশ মুখার্জী, অসিত সেন, নবেন্দু ঘোষকে। নিজের টিমে সামিল করেছেন পল মহেন্দ্র, নাজির হুসেনদেরও। পরবর্তী সময়ে ঋত্বিক ঘটককেও তিনি বম্বেতে ডেকে নিয়েছিলেন তাঁর ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাছে। বিমল রায়কে। শুধু নির্দেশনাই নয়, কাহিনী থেকে শুরু করে শিল্পী নির্বাচন সব কিছুর দায়িত্বই তাঁর। বিমল রায় শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' কাহিনীটি বেছে নেন। চিত্রনাট্য নবেন্দু ঘোষের। এই ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় অশোক কুমারের পাশে প্রথম সুযোগ পেলেন মীনা কুমারী। তারপর তো ইতিহাস। বাংলার অসিতবরণ (পরিণীতা), বসন্ত চৌধুরী (পরখ) প্রমুখ শিল্পীদেরও তিনি সুযোগ দিয়েছেন। সুচিত্রা সেনকেও প্রথম বম্বে নিয়ে যান বিমল রায়, তাঁর 'দেবদাস' ছবিতে পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য, দিলীপ কুমারের বিপরীতে। 'বন্দিনী' ছবিতে নূতনকেও তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করান। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর ছবিতে অভিনয় করেছেন।

মধুমতী

বিমল রায়ের পুত্র জয় রায়কে সম্প্রতি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এতো ছবির মধ্যে পরিচালকের নিজের পছন্দের ছবি কোনটি? প্রত্যেক শিল্পীরই তাঁর সৃষ্ট সব সৃষ্টিই একান্ত প্রিয়।

সত্যিকারের সকলের দাদা

বম্বেতে বিমল রায়ের বাড়ি ছিল সকল নবাগতের জন্য অবারিত দ্বার। হৃষিকেশ, অসিত, নবেন্দু যখন বম্বেতে পায়ের তলায় মাটি খুঁজছেন। নির্দিষ্ট আয় যখন কারও নেই, তখন বিমল রায় ও তাঁর স্ত্রী মনোবীণা রায় এঁদের পাশে ছিলেন। মাসের পর মাস এদের খাওয়াদাওয়া বাঁধা ছিল বীণাবৌদির বাড়ি। তেমনই পল মহেন্দ্র, নাজির হুসেন—এঁদেরও ভরসাস্থল ছিল এই রায় পরিবার। বিমল রায় শুধু একজন চলচ্চিত্রকারই নন প্রকৃত অর্থেই তিনি এক প্রতিষ্ঠান। সেদিনের হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, বাসু ভট্টাচার্য থেকে আজকের মণিরত্নম সকলেরই আদর্শ তিনি।

সাহিত্যনির্ভর ছায়াছবি

দো বিঘা জমিন, অঞ্জন গড়, উদয়ের পথে থেকে শুরু করে বিমল রায়ের প্রায় সব ছবিই ছিল সাহিত্য নির্ভর। ছবিতে আগাগোড়া একটা কাহিনীর অমোঘ টান থাকায় তার সব ছবিই হয়েছিল রসোত্তীর্ণ। অশোক কুমার তখন কিসমত, অচ্ছুত কন্যা, মহল প্রভৃতি সুপার ডুপার হিট ছবি করে বোম্বেতে নিজের জায়গাটা বেশ পোক্ত করে নিয়েছেন। বোম্বের টকিজ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নিজের প্রোডাকশন চালু করে প্রথমেই ডাক দিলেন

শব্দরূপ - ৫৩২

চারুলতা সেন

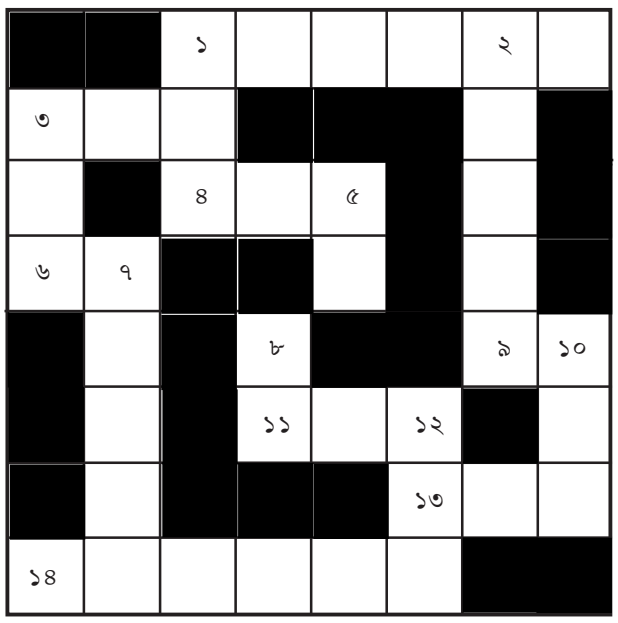

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রতি শব্দে গগনচারী, দুয়ে-তিনে শরতের ফুল, শেষ তিনে বিহারের লোক, ৩. শিবের এক নাম, বিশেষণে অভীষণ, ৪. ললাটিকা, শেষ দুয়ে ইঙ্গ তালা, ৬. রাম তনয়, ৯. সর্প, ১১. ব্যাধ, তিয়র জাতি, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, ১৩. মিথিলার রাজা সীতার পিতা, এঁর প্রকৃত নাম সীরধবজ, ১৪. বিশেষণে আয়ত্ত, প্রথম দুয়ে খাজনা, শেষ দুয়ে অতীত, একে-চারে যন্ত্র।

উপর-নীচ ঃ ১. নীরাজনা, ২. সুগন্ধ সাদা ছোট পুষ্পবিশেষ, একে-চারে অট্টহাসির ধ্বনি, শেষ দুয়ে বিশেষণে আক্রান্ত, ৩. বর্ষীয়ান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী—বিহারী বাজপেয়ী, ৫. এই ঋষি শকুন্তলার পালিতা পিতা, ৭. তৎসম শব্দে আহুতি, হোম, এক-তিনে ন্যাগ্রোধ, শেষ দুয়ে ফ্যাসাদ, ৮. ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, ১০. প্রতিশব্দে গণৎকার, গণনাকারী দৈবজ্ঞ, ১২. রৌপ্য, বিশেষণে সাদা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩০

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
রঞ্জিত দাস,
ঝালদা, পুরুলিয়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● **৫৩১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ জানুয়ারী, ২০১০ সংখ্যায়**

পরলোকে সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বার্ধক্যজনিত কারণে পর গত ২৮ ডিসেম্বর স্বনামধন্য শিল্পী সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ৮৭ বছর

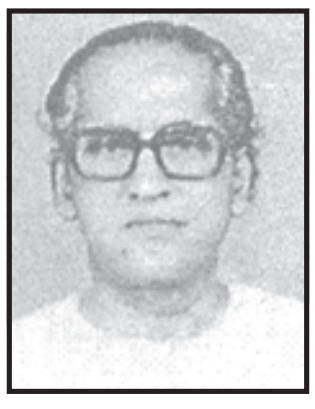

বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে সংস্কার ভারতী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত তিনি সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি ছিলেন। সঙ্গীতে 'সঙ্গীত ভারতী', 'সুরসাগর', 'সঙ্গীত গুণাকর' প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর বড়দা ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের সঙ্ঘচালক। ভাইপো বিশিষ্ট শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ওই সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

২৬/১১-র একবছর বাদেও মোকাবিলার প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ

অজয় সাহানী

২৬/১১-র ঘটনার সঞ্জাত ব্যর্থতাগুলিকে চাপা দিতে এবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উজ্জীবিত হয়ে কিছু ব্যবস্থা নিতে চলেছে। এই নারকীয় ঘটনা মুম্বাইয়ে ঘটে যাবার পরেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের মতানৈক্যকে সরিয়ে রাখতে পারেনি, ফলে দেশ এখনও পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তেমন একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

দুটো বিষয়-ই অর্ধসত্য। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে যে পুনর্বিন্যাস চলছে তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কেবল কেন্দ্রীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে—সেই অবহেলা, বঞ্চ নার আবর্তেই রয়েছে। অবশ্যই মুম্বাইয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অন্য কিছু রাজ্যও তাদের ঢিলেঢালা পুলিশি ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে চাইছে। এইভাবে জাতীয় প্রচেষ্টাকে এক সূত্রে আনার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং এর খামতি কতটা তা বোঝা যাবে আরেকটা সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটলে পরে। বাস্তবিকই যে ব্যক্তি ২৬/১১ ঘটনার পরবর্তী সময়ে দেশের নিরাপত্তার ফের বদল ঘটানোর কৃতিত্বের দাবীদার সেই চিদাম্বরম্ অক্টোবর ২৬, ২০০৯-এ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ২০০৮-র ২৬/১১-র পর দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থায় খুব বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

তথাপি গত একবছরে কিছু পরিবর্তন এসেছে নিরাপত্তায়—যেমন বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা। চারটি মেট্রো শহরে এন এস জি-র ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, চালু হয়েছে ইউ এ পি এ আইন। এই বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদ নিরোধক আইন অবশ্যই সন্ত্রাস মোকাবিলায় সাহায্য করবে। বাজেট বরাদ্দ ৬ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও উপকূলরক্ষায় এবং অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে উপকূলে রাডার ব্যবস্থাকে জোরদার করতে। জলের তলায় চৌকিদারি করতে 'মিডজেট সাবমেরিন' সংগ্রহ করা হচ্ছে। যৌথ কেন্দ্র খোলা হয়েছে মুম্বাই, বিশাখাপত্তনম, কোচি এবং পোর্টব্লেয়ারে।

নতুন অপরাধী তল্লাশি, নেটওয়ার্কিং এবং অন্যান্য সিস্টেম প্রোজেক্টে ২ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। একটি জাতীয় ইন্টেলিজেনস গ্রিড তৈরি করা হয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সত্বর তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে। অনলাইন তথ্য আদান- প্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দাদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি র ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তদন্ত ব্যুরোয় ৬ হাজার নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত যৌথ টাস্ক ফোর্স জরুরী ভিত্তিতে গঠনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীও নিজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর খুলে আরও শক্তি বৃদ্ধি করে ৩৮টি ব্যাটেলিয়ান করা হচ্ছে। এইভাবে তালিকা বৃদ্ধি করে লোককে দেখানো হচ্ছে যে তাদের মিথ্যা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে মুড়ে ফেলা হচ্ছে।

মুম্বাইয়ে ফোর্স-১, একটি রাজ্য স্পেশাল পুলিশ ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বর্তমান এর শক্তি ২১৬ জনের (নির্ধারিত শক্তি ৩৫০ জন)। পাঁচটি কুইক রি-অ্যাকশন টীম গঠিত হয়েছে ২০০ জন সদস্যের। সন্ত্রাস দমনের দুই সদস্যের মোটর সাইকেল বাহিনি যারা রাস্তায় টহল দেবে। উনচল্লিশটি বুলেট প্রুফ কমব্যাট ভেহিকেলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যারা পাবলিক ইউটিলিটি স্থানগুলির

রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আধুনিক হাতিয়ারে সজ্জিত বিভিন্ন স্পেশাল টিম রয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশে ১৫ হাজার সদস্যের এক অতিরিক্ত বাহিনী তৈরির কথাও বলা হচ্ছে।

এইসব বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তিনটি ভিন্ন কারণে ভিত্তিহীন। এদের বেশিরভাগই কেবল পরিকল্পনা, কবে এগুলি চালু হবে কে জানে। বছর বছর ধরে পদগুলি খালি এবং যুগ-যুগান্ত ধরে বাস্তবের সঙ্গে পরিকল্পনার বিস্তর ফারাক চলে আসছে কেবল অবহেলার পরিণতিতে। এসব বিষয়গুলি কেবলই জরুরী বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বিশেষভাবে বলা যায় এসব ব্যবস্থায় প্রকল্পগুলি কেবলমাত্র সন্ত্রাস দমনের মতো ব্যবস্থাকে জোরদার করায় স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা। কার্যত সাধারণ পুলিশি ব্যবস্থা সহ গোয়েন্দাশক্তি বাড়াবার সামর্থ্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো হচ্ছে।

এখানে সামগ্রিকভাবে সমগ্র ব্যবস্থার ওপর আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবুও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গত এক বছরে মাত্র একটি অ্যাডভান্সড অফশোর প্যাট্রল ভেসেল এবং দুটি মাত্র ইন্টারসেপটেড বোটকে কার্যকর করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রদপ্তর উপকূল সুরক্ষায় ৪২টি নৌকা দিয়েছে। আরও ১৫২টি নৌকার পরিকল্পনা লাল ফিতেতে আটকে রয়েছে। আশিটি 'ইন্টারসেপটর ক্র্যাফ্ট' সংগ্রহ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কাহিনী বর্তমানে ৩৮টি পরিকল্পিত ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে মাত্র দুটি ব্যাটলিয়ানকে সক্রিয় করা হয়েছে। বাস্তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেছে যে, আই পি এস অফিসারদের ঘাটতি মেটানো হবে প্রতি বছর। কিন্তু বর্তমানে যে ঘাটতি রয়েছে তা মেটাতে গেলে দীর্ঘ ১১ বছর লেগে যাবে। গঠনতান্ত্রিক বাধার কারণে ৬ হাজার পরিকল্পিত অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন তদন্ত ব্যুরো মাত্র কয়েকশ' জনকে নিয়োগ করতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত, মানতে হবে যে প্রতিরক্ষায় কোনও স্থায়ী পরিকল্পনা নেই। সন্ত্রাসবাদ-এর উৎসমুখ যেখানেই থাক—স্বদেশে বা বিদেশে, তার উৎপাটন দরকার সমূলে। কিন্তু গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই অপ্রতুল। আমরা ভেঙ্গে পড়া আইনশৃঙ্খলা এবং বিচার ব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কোনও মতেই দরাজহস্তে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে পারব না। সন্ত্রাসবাদকে সামনে রেখে এবং দেশের অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার সুরাহা না করতে পারলে তা দেশের পক্ষে, জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হবে। আমাদের দেশে একই পরিকাঠামোয় আমরা সন্ত্রাসবাদ, সাধারণ অপরাধ এবং ভয়ঙ্কর অপরাধগুলিকে মোকাবিলা করছি।

দেশে অধিকাংশ অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদকে একই পদ্ধ তিতে বানানো হচ্ছে এবং অধিকাংশ নেতাদের বিশেষত রাজ্যস্তরে এক গা-ছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে সাধারণ অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত ব্যবস্থাদি নেওয়ার ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, মুম্বাইয়ে দাউদের গ্যাং—যারা ১৯৯৩ সালে যে হামলা চালিয়ে ২৫৭ জনকে হত্যা করেছে এবং তারাই পাকিস্তানের আই এস আইয়ের মূল্যবান সম্পদ, এদেশে রাজনৈতিক ছাতার তলায় দিব্যি তাদের কাজ-কারবার প্রকাশ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য দেশে তা সম্ভব নয়।

বাস্তব সত্য হল যে, ২৬/১১ এবং বেড়ে যাওয়া সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি হানা এবং রাজনৈতিক হিংসা যে ভাবে দেশজুড়ে ছড়াচ্ছে তা দমনের ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। অন্য সমস্যাগুলি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কেবল ঔদাসীন্যে, দুর্নীতির আড়ালে। এইরকম দায়সারা জবাবের ওপর আমরা নিঃশঙ্ক হতে পারি না। *(সৌজন্যে ঃ দি পাইওয়নিয়র)*

রজত জয়ন্তীতে রক্তদান শিবির

সারদা শিশুতীর্থ, মাথাভাঙ্গা-র রজত জয়ন্তী বর্ষের বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে গত ২৯শে নভেম্বর ২০০৯ মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠে সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় মানবকল্যাণে রক্তদান ও শিশুদের রক্তের শ্রেণী নির্ণয় শিবির। তাতে শিশুতীর্থের আচার্য ও অভিভাবক—অভিভাবিকা মিলে ৪৫ জন রক্তদান করেন এবং শতাধিক শিশুর রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। বিকাল ৫-টায় দুদিন ব্যাপী শিশু বিজ্ঞান মেলার শুভ সূচনা করেন বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি তথা উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবানিবৃত্ত গণিত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সত্যপদ পাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সমীর দাস।

এই শিশু বিজ্ঞান মেলায় সারদা শিশুতীর্থ - মাথাভাঙ্গা ছাড়াও জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ি, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, নিশিগঞ্জ, সিতাই, জামালদহ, নগর ডাকালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকেও শিশুরা বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক নানাবিধ মডেল প্রদর্শন করে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেলায় অংশগ্রহণ করে। মাথাভাঙ্গা শহরের বুকে এই ধরনের অভিনব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান মাথাভাঙ্গাবাসীর প্রশংসা পেয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানেই উৎসাহী মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল।

সংস্কৃত প্রশিক্ষণবর্গ

গত ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের ত্রৈমাসিক সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল মালদা নেতাজী সুভাষ রোড সরস্বতী শিশু মন্দিরে। দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গবেষক এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রী ডঃ নিমাই চন্দ্র ঝা ও মালদা বি. এড কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ। গত ২৫ আগস্ট উদ্বোধন হয়েছিল সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের। মোট ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহে তিনদিন উপস্থিত থেকে সংস্কৃতে কথাবার্তা শিখেছেন।

এই ছাত্রছাত্রীরা সকলেই একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ছিল। বর্গে জিনাত আইরিন শবনম নামে এম. এ. উত্তীর্ণ এক মুসলিম মহিলাও শিক্ষার্থী ছিলেন। সম্ভাষণ বর্গের দীক্ষান্ত ভাষণে ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ সংস্কৃতে কথাবার্তার প্রশিক্ষণের এই প্রয়াসকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ বলে উল্লেখ করেন। নাটিকা, সংস্কৃত গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সকলেই উপভোগ করেছিল। শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

ত্রৈমাসিক সংস্কৃত

সমাবেশ সমাচার

প্রশিক্ষণ শিবির

খগেন্দ্রনাথ-উর্মিলাদেবী স্মৃতি-ভবনে (আগমেশ্বরী পাড়ায়) রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবর্তিত ও নবদ্বীপ সংস্কৃত পরিষদ-পরিচালিত ত্রৈমাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথমা-দীক্ষার সমাপ্তি-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল গত ৩ ডিসেম্বর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বৃন্দাবনধর গোস্বামী ও প্রধান-অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য ও হরিহর চট্টোপাধ্যায়। প্রারম্ভে প্রদীপ প্রজ্বলন, সরস্বতী-বন্দনার পর মঙ্গলাচরণ করেন অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন সংযোজক ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী। পরে শিক্ষার্থীগণ সংস্কৃতে কার্যক্রম পরিবেশন করে। উল্লেখযোগ্য সর্বাণী চক্রবর্তী, তনুশ্রী কর্মকার ও নয়নমণি হালদার সমবেত কণ্ঠে সংস্কৃতে গীত পরিবেশন করে। সংস্কৃত ভাষণে তাদের অনুভব বর্ণনা করে রাকেশ ঘোষ, সমীর পাল ও সর্বাণী চক্রবর্তী। প্রশিক্ষক জয়ন্ত দেবনাথ তাঁর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা সংস্কৃত লঘুকথার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অধ্যাপিকা পরানন্দা নন্দীর শ্রীরাম ভজন। ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য সরল সংস্কৃতে সম্ভাষণের বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যাঁরা সংস্কৃতে পড়েও সংস্কৃতে কথা বলে তাদের জীবন সার্থক। তাদের মধ্যে কুসংস্কার দূরীভূত হয়। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ শান্তিময় ভট্টাচার্য ও সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য। সমবেত ঐক্যমন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

অর্শ চিকিৎসা শিবির অসম

সেবা ভারতী'র পরিচালনায় গত ২১ থেকে ২৩শে নভেম্বর অসমের শিলচর মহকুমায় যথাক্রমে কাটিগড়া ও লক্ষ্মীপুরে এবং হাফলং শহরে ৩টি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি. সি. সাহা ইঞ্জেকশন পদ্ধ তিতে উক্ত শিবিরগুলিতে মোট ৯৫ জন রুগীর চিকিৎসা করেন। সংঘ পরিবারের বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ শিবিরগুলি পরিচালনায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

পূর্বস্থলী

সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ১৩ই ডিসেম্বর পূর্বস্থলী থানার কালেখাঁতলা প্রাইমারী স্কুলে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি. সি. সাহা ইঞ্জেকশন পদ্ধ তিতে মোট ৪৫ জনের চিকিৎসা করেন। উল্লেখ্য, বিশ্বনাথ সাহা (প্রচারক) উপস্থিত থেকে শিবির পরিচালনা করেন। স্থানীয় জনগণ সবরকম সহযোগিতা করেন।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নিমতা রবীন্দ্রপল্লী নিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। গত ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৭.৩০টা নাগাদ তিনি কলকাতা আর জি কর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পরিবার সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর, স্ত্রী সহ তিন পুত্র বর্তমান।

Swastika
4 January - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

কলকাতায় সেবিকাদের পথসঞ্চলন।

ভাষণরত জ্ঞানানন্দময়ী মা। (বাঁ দিক থেকে বসে) শরদ রেণু, সন্ন্যাসিনী, সুলভা দেশপাণ্ডে ও মহুয়া ধর।

কলকাতায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষার এক ক্ষুদ্র রূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ''স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ১০০ জন যুবক-যুবতী পেলে ভারতের চিত্র পাল্টে দেব। আজ এখানে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকাদের মধ্যে স্বামীজীর সেই চাওয়ার বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি।''— উপরের এই কথাক'টি বললেন সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মা', হৃদয়পুর প্রণব কন্যা আশ্রমের সহ-সভানেত্রী। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহিলা শাখা।

জ্ঞানানন্দময়ী মা গত ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার বিনানী ধর্মশালার সভাগৃহে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পূর্ব এবং পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের কার্যকর্ত্রী সেবিকাদের তিন দিনের শিবিরের প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন। তিনি ভারতমাতা, সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বন্দনীয়া মৌসীজী এবং দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া তাইজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেও রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সময় দিতে হবে। এদেশের হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেই অন্যরা ঠিক পথে যাবে। এজন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু মিলন মন্দির এবং হিন্দু রক্ষীদল গড়ে তুলে ছিলেন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ভাব মনের গভীরে প্রবেশ করলে আর ভেদাভেদ থাকে না। বন্দনীয়া মৌসীজী ও বন্দনীয়া তাইজীর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তিনি উপস্থিত সেবিকাদের আহ্বান জানান। জ্ঞানানন্দময়ী মা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী মহুয়া ধরকে তাঁর আশ্রমেও এরকম শিবির আয়োজন করে ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের সংস্কারিত করতে অনুরোধ জানান।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী সুলভা দেশপাণ্ডে। তিনি ১৯৩৬-এ মহারাষ্ট্রের ওয়ার্দ্ধায় বন্দনীয়া মৌসীজী কর্তৃক রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং সমিতির কাজের ধারা এবং বন্দনীয়া সরস্বতী তাই আপ্টের জীবনের বিভিন্ন দিক তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, সমিতির দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা সরস্বতী তাই আপ্টের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেই দুইক্ষেত্রের (অসমক্ষেত্র এবং বঙ্গক্ষেত্রে) দায়িত্বশীল কার্যকর্ত্রীদের এই শিবির। তিনি আরও বলেন, মাতৃশক্তিই ভারতমাতাকে জগজ্জননীর আসনে বসাতে পারে। মা-ই তাঁর সন্তানকে সংস্কার দিয়ে গড়ে তোলেন। সমিতির প্রার্থনায় রয়েছে—'বয়ম্ ভাবী তেজস্বী রাষ্ট্রস্য ধন্যাঃ জনন্যাঃ ভবেৎ।। সুশীলাঃ সুধীরাঃ সমর্থাঃ সমেতাঃ'—এজন্য পুরাণ ও ইতিহাসের প্রতি সিংহাবলোকন করতে হবে। জননী জীজাবাঈ-এর জন্যই সুযোগ্য সন্তান শিবাজী মহারাজ স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু শত্রু ইংরেজ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরই নির্দেশে তাঁর মৃতদেহ চিতায় তোলা হয়েছিল। সুলভা দেশপাণ্ডে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে সতত প্রয়াসের আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সংযোগক্রমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত শিবির পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত সেবিকাদের মার্গদর্শন করেন। তিনি গল্প-কথার মাধ্যমে সেবিকাদের ধেয়পথে নিজ কর্তব্যে অবিচল অটল থাকার কথা বলেন—

ইধর উধর দেখো মৎ
অপনী রাহ ছোড়ো মৎ
অপনী রাহ পর দৌড়তে রহো
অন্ত তক ভাগতে রহো।

মোহনজীর সঙ্গে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন।

২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'নেতাজী গবেষক' খ্যাত ডঃ পূরবী রায় শিবিরে আসেন ও বক্তব্য রাখেন। ২৭ ডিসেম্বর, রবিবার সকালে প্রায় ছয়শত সেবিকাদের এক বর্ণাঢ্য পথসঞ্চলন হয়। ঘোষবাদ্যসহ গণবেশ পরিহিতা সেবিকাদের এই পথ সঞ্চলন সকাল দশটায় গোয়াবাগান পার্ক থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার শিবির স্থান বিনানী ধর্মশালায় ফিরে যায়।

এই শিবিরে অসম ক্ষেত্র থেকে (অসম সহ সাতটি রাজ্য) ৩২৬ জন এবং বঙ্গক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং ওড়িশা) থেকে ২২৮ জন সেবিকা যোগ দেন। এছাড়াও অনেকে ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর শিবিরে সমারোপ ভাষণ দেন অখিল ভারতীয় সহ-সেবাপ্রমুখ সুনীতা হলদেকর। সমিতির অঃ ভাঃ বৌদ্ধিক প্রমুখ শরদ রেণু শিবিরে পুরো সময় উপস্থিত থেকে মার্গদর্শন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর অসম প্রান্তের প্রান্ত সঞ্চালিকা ডাঃ মালতী বরুয়া।

সম্মেলনস্থলে সেবিকারা।

প্রকাশিত হবে ১১ জানুয়ারি '১০ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ১১ জানুয়ারি '১০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ধর্মের রক্ষায়, জাতির পরিত্রাণে ও বিশ্বের মহাকল্যাণ সাধনের জন্য নবদ্বীপের নিমাই হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর জাতিকে নববলে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে নিমাই হরিনাম করতে করতে গিয়েছিলেন পুরীধামে। মহাপ্রভুর এই নীলাচল গমনের ৫০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্বস্তিকা-র আগামী সংখ্যার নিবেদন – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাসংকীর্তন যাত্রা।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।